



দুই মহাদেশের উপকথা

এষা দে



ଦୁଇ ମହାଦେଶ୍ୟେ ଉଦ୍‌କଥା

ଏଷା ଦେ



ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ

মুঢ়ি

ভগবানের প্রথিবী ত্যাগ (আফ্রিকা)	৭
এ তো আমাদেরই মেয়ে (আফ্রিকা)	১২
অতি বৃদ্ধির গলায় দড়ি (আফ্রিকা)	১৮
মানুষ বনাম তিমি (উত্তর আমেরিকা)	২৩
যেমন কর্ম তেমনি ফল (আফ্রিকা)	২৯
মাত্র এক ছড়া ভূট্টা (আফ্রিকা)	৩৬
গাইয়ে পিপে (আফ্রিকা)	৪৩
রাতের আলো (উত্তর আমেরিকা)	৪৮
কী বাহাদুর মানুষ! (আফ্রিকা)	৫২
প্রস্তরবক্ষের অলৌকিক কার্যকলাপ (উত্তর আমেরিকা)	৬০
জয় হোক মানুষের (মেক্সিকো ও মধ্য আমেরিকা)	৬৬



ভূমিকা

আমার দীর্ঘ অধ্যাপনার পেশায় গবেষণার খাতিরে নানা দেশের রূপকথা ও পুরাকাহিনির সঙ্গে পরিচয় হয়। এগুলির মধ্যে আফ্রিকা এবং উত্তর ও মধ্য আমেরিকার আদিবাসিন্দাদের লোককথা আমার মনোযোগ আকর্ষণ করে। কারণ এশিয়া, ইয়োরোপ বা মিশরের মতো ধূপদি সভ্যতার পুরাকাহিনির থেকে এগুলির চরিত্র স্বতন্ত্র। যে বইগুলিতে এদের সূত্র পাই সেগুলি গবেষণার আকরণস্থানে নির্দিষ্ট। আদৌ শিশু বা কিশোর পাঠ্য নয়। আমার দুই পুত্র তখন ছোটো এবং আমরা পশ্চিমবঙ্গের বাইরে জীবিকার প্রয়োজনে প্রবাসী। তাদের গল্প শোনাবার তাগিদে এবং হাতের কাছে যথেষ্ট বাংলা বই না থাকায় এই সূত্রগুলির বীজ থেকে বৃক্ষ সৃষ্টি করি। আবাসিক বিদ্যালয়ে তাদের অবস্থিতির সময় চিঠিতে লিখে লিখে পাঠাই। একরকম বলতে গেলে মায়ের কর্তব্যপালনের চেষ্টা গল্পগুলির উৎস।

পরে পিতৃবন্ধু প্রয়াত শিশু সাহিত্যিক হরেণ ঘটক একদিন কথায় কথায় আমার কাহিনিগুলির কথা শোনেন ও দেখতে চান। তাঁর উৎসাহে কয়েকটি গল্প জনপ্রিয় পত্রপত্রিকায় ছাপাও হয়। তবে আমি বড়োদের জন্য লেখালেখিতে ব্যস্ত থাকায় এগুলির কথা আর ভাবিনি। অবসরগ্রহণের পর কলকাতায় ফিরে দেখছি আমাদের বর্তমান শিশু ও কিশোর সাহিত্য এবং বিনোদনে বিজ্ঞান কারিগরিবিদ্যা ও অলীক ফ্যানটাসি শাসিত এক জটিল সভ্যতার দাপট, যার মূল সুর প্রায়শ উদ্ভেজনা, সংঘর্ষ এবং উর্ধ্বশ্বাসগতি। বিশ্বায়নের দৌলতে আমাদের গ্রাস করতে বসেছে আধুনিক প্রথম বিশ্ব। অথচ এর বাইরে আছে আর এক পৃথিবী, অন্য এক সময়, এক আদিম সংস্কৃতি যেখানে পাওয়া যায় অমল সরলতা, ধীর লয় এবং শান্ত সমন্বয়। যেখানে প্রকৃতি পরিবেশ ও প্রাণীদের আদান প্রদান চিরন্তন, সর্বময় কর্তৃত্ব কোনো শক্তির নেই। অলৌকিকের ভূমিকা সীমিত এবং মানুষ যে শুধু তার কল্পনা, বুদ্ধি ও হৃদয়ের ঐশ্বর্যে জয়ী, এই সত্যটি বারবার প্রতিপন্ন। এমন একটি জগতের সঙ্গে পরিচয় আজকের দিনে আমাদের সমাজে শিশুদের গড়ে ওঠার সময় শুধু শিক্ষাপ্রদাই নয়, অনাবিল আনন্দেরও বটে।

ভগবানের পৃথিবী শ্রাগ

ভগবান যখন বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করলেন, তখন ভাবলেন এই পৃথিবীরই এক কোণে তিনি বাস করবেন। নিজের জন্য আলাদা করে জায়গা জমি রাখলেন। তার এক প্রান্তে বাড়ি করে থাকতে লাগলেন। দূর থেকে মানুষের সংসারযাত্রা দেখেন আর চিন্তা করেন কী উপায়ে মানুষের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ থাকবে। নিজে আগ

বাড়িয়ে সব সময় পৃথিবীর

লোকজনের সঙ্গে ভাবসাব

করাটা তো ঠিক হবে না।

হাজার হোক, ভগবান বলে

কথা! মানুষ তো সামান্য জীব,

তাঁরই হাতে গড়া। তিনি

সর্বশক্তিমান দুর্শ্঵র। তাদের

মালিক। আর করলে মানুষেরই

বা তাঁর প্রতি তেমন ভক্তিশূদ্ধা

থাকবে কেন? সাত-পাঁচ ভেবে-

টেবে তিনি এক দৃত সৃষ্টি করলেন।

নাম দিলেন লেগবা। তার কাজ হল

ভগবান ও মানুষের মধ্যে সম্পর্ক

রাখা। মানুষের কাজকর্ম সুখদুঃখের

খবর সে ভগবানকে জানায়। আবার

ভগবানের হুকুম মানুষকে পৌছে দেয়।

এইভাবে দিন যায়।

মাঝে মাঝে ভগবান লেগবাকে

এমন সব জিনিস করতে বলেন যা

মানুষের মোটেই পছন্দ হয় না।

প্রায়ই ভগবানের আদেশ মানতে

বড়ো কষ্ট হয় পৃথিবীর বাসিন্দাদের।

কিন্তু লেগবা তো হুকুমের পাত্র।

ভালোমন্দ সবরকম কাজই তাকে মুখ

বুজে করে যেতে হয়।



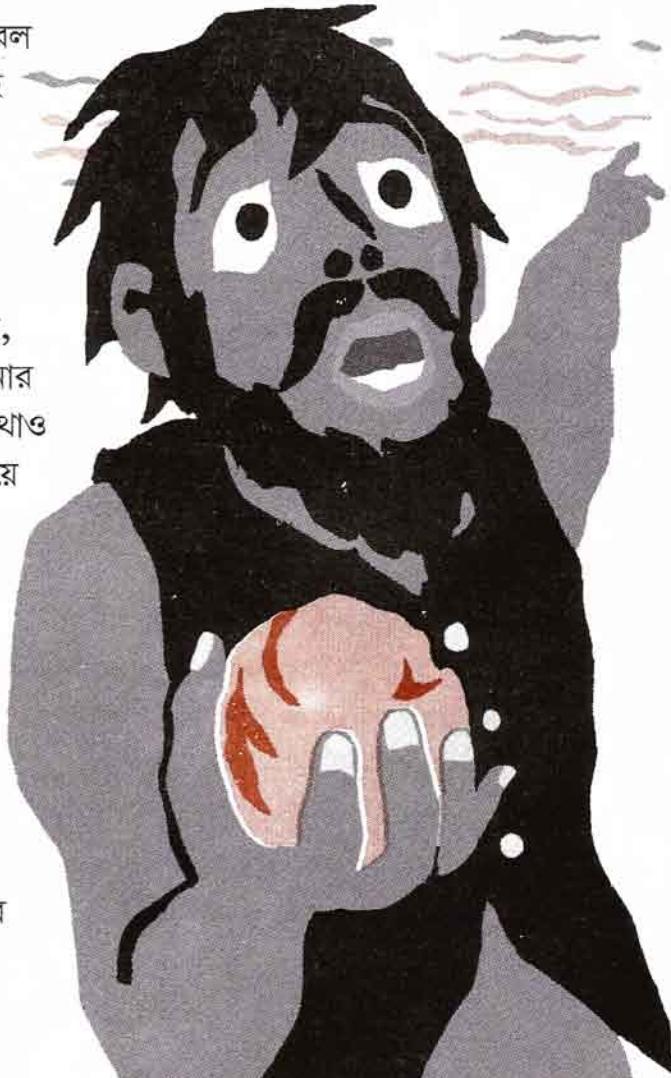
কিছুদিন যেতে না যেতে সে দেখে এক অঙ্গুত ব্যাপার। সে যখন মানুষের মনের মতো কাজ করে, কেউ তার নামও মুখে আনে না। সবাই ভগবানকে ধন্যি ধন্যি করে। আর যেই তার দ্বারা মন্দ কিছু ঘটে, অমনি সব দোষ তার ঘাড়ে। সকলে বলে, লেগবাটা হচ্ছে যত নষ্টের মূল। তার কপালে প্রশংসা কোনোদিনই জোটে না।

ভারী তিতিবিরস্ত লেগবা। একদিন সাহস করে ভগবানকে জিজ্ঞাসা করে বসে, প্রভু, আমি তো খালি আপনার হুকুমই পালন করি। অথচ ভালো হলে আপনি পান পুজো আর সব খারাপের জন্য আমি পাই মুখব্যামটা। এমন কেন প্রভু?

ভগবান উত্তর দিলেন, বৎস এর নাম সনাতন ধর্ম। জগতের নিয়ম এই। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যিনি অষ্টা, মানুষ তাঁকে মঙ্গলময় রূপেই কল্পনা করতে চায়। অথচ মানুষের জীবন সুখদুঃখে মেশামেশি। দুঃখের দায়িত্ব কার? মানুষ নিজে সে দায় নিতে চায় না। সে খোঁজে শুধু সুখ। কাজেই তৃতীয় কারোকে দরকার যার ওপর বর্তাবে সব অঙ্গালের দায়। তুমিই সেই তৃতীয় পক্ষ। তোমার জীবনের উদ্দেশ্যই হল দোষ ঘাড়ে নেওয়া। সেই জন্যই তুমি মানুষ আর আমার মাঝখানে দৃত।

বলাবাহুল্য বক্তৃতাটা মোটেই লেগবার মনে ধরল না। ইস্ত, যত দোষ নন্দ ঘোষ! দাঢ়াও দেখাচ্ছি মজা। লেগবা রীতিমতো মাথা ঘামাতে শুরু করে। কী করে ভগবানকে জব্দ করা যায়। অনেক ভেবেচিষ্টে সে একটা ফন্দি আঁটল। একবার ভগবানের খেত জুড়ে ফলেছে রাঙা আলু। লেগবা গিয়ে ভগবানকে বলে আসল, প্রভু, সাবধানে থাকবেন। চারিদিকে রটে গেছে আপনার খেতের মতো মোটা মোটা রাঙা আলু আর কোথাও হয়নি। আপনার রাঙা আলুর খবরে সবার জিভ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। কেউ কেউ নাকি বদ মতলবও আঁটছে। রাতবিরেতে এসে হঠাতে আপনার খেতে হামলা করবে। সব রাঙা আলু তুলে নিয়ে গিয়ে নিজেদের পেট ভরাবে।

শুনে তো ভগবানের ভারী দুশ্চিন্তা। খুব ব্যস্তসমস্ত হয়ে নিজেই পৃথিবীর লোকজনদের ডেকে বললেন, দেখো হে, আমার খেতের রাঙা আলুতে যদি কেউ হাত দিয়েছে তার আর রক্ষে থাকবে না। আমি ঈশ্বর, তোমরা মানুষ। সব



সময় যেন এটা খেয়াল থাকে। কারো যদি নজর লেগে থাকে আমার খেতের আনাজে, এই বেলা নিজেকে সামলে নাও। নইলে সকলের কপালে খুব দুর্ভোগ আছে বলে দিলাম।

সকলে তো ভয়ে কাঠ। স্বয়ং ভগবান রাগ করেছেন। কী সাংঘাতিক ব্যাপার! তাদের মধ্যে সাহসী একজন কোনোরকমে কাঁপতে কাঁপতে হাত জোড় করে বলে, না, না। সে কি কখনো হয় প্রভু! আমরা সামান্য মানুষ। আপনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, আমাদের দণ্ডমুণ্ডের মালিক। আপনার জিনিসে হাত দেওয়া তো আমাদের মহাপাপ। না খেতে পেয়ে বরং শুকিয়ে মরব, তবু আপনার খেতের ফসলের দিকে চাইব না। কখনোই না।

ভগবানের রাগ তো খানিকটা কমল। বললেন, যা, যে যার বাড়ি ফিরে যা।

সবাই তো হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

নিশুতি রাত। চারিদিক নিষ্ঠৰ্ধ, নিঝুম। চুপিচুপি খিড়কি দরজা দিয়ে একটা বস্তা বগলে লেগবা দোকে ভগবানের বাড়ি। দাওয়াতে ভগবানের চটিজোড়া রাখা থাকে। পা টিপেটিপে চটিজোড়া তুলে নিয়ে লেগবা বাইরে বেরিয়ে আসে সদর দরজা দিয়ে। তারপর চটিজোড়া পায়ে গলিয়ে ধীরেসুস্থে চলে রাঙা আলুর খেতের দিকে। অন্ধকারে কিছু অসুবিধা হয় না। ভগবানের জমিজায়গা ঘরদুয়ার সবেই তার অবাধগতি।

কিছুক্ষণ আগেই এক পশলা খৃষ্টি হয়ে গেছে। নরম ভেজা মাটিতে লেগবার পায়ের ছাপ বেশ গভীরভাবে একটার পর একটা বসে যেতে থাকে। রাঙা আলুর খেতে পৌঁছে একটার পর একটা রাঙা আলু তুলে একটা বস্তায় ঝাটাপট সেগুলো ভরতে থাকে সঙ্গে সঙ্গে। তোলে আর ভরে, তোলে আর ভরে। খেতের পুরো রাঙা আলু এইভাবে বস্তা বোঝাই করে সে নিয়ে চলে বনের ভেতর। বেশ খানিকটা গিয়ে একটা নিরিবিলি জায়গা দেখে মাটি খুঁড়ে বস্তাটা পুঁতে ফেলে। জায়গাটা একটা ঢিবির মতো হয়ে থাকে। লেগবা তাতেই খুশি। এখন জোরে জোরে পা ফেলে সদর দরজা দিয়ে ভগবানের বাড়ি ঢুকে চটিজোড়া ঠিক যেমনটি ছিল তেমনটি দাওয়ায় সাজিয়ে রেখে খুব আলতো পায়ে খিড়কি দিয়ে ফিরে যায় নিজের আস্তানায়।

ভোর হতে না হতেই লেগবা ছুটল ভগবানের বাড়ি। তখনও ঘুম ভাঙ্গেনি ভগবানের। সদর দরজাটা নিজেই রাতে ভেতর থেকে বন্ধ করে খিড়কি দিয়ে বেরিয়েছিল। এখন দুম দুম করে দরজা ধাক্কিয়ে চিংকার জুড়ে দেয়, প্রভু সর্বনাশ হয়েছে, উঠুন উঠুন! খেতের সব রাঙা আলু কে রাতে এসে তুলে নিয়ে গেছে। হায় হায় কোন হতভাগার এমন আস্পদ্বা হল! ভগবানের জিনিসে লোভ! কী পাপ, কী পাপ। হায় হায়! তার যে ইহকাল পরকাল সব গেল।

লেগবার কথা শেষ হওয়ার আগেই ভগবান লাফ দিয়ে বিছানা ছেড়ে এক দৌড়ে খেতের কাছে চলে গেছেন। দেখেন কী, সত্যিই তো কোথায় গেল তার এত সাথের রাঙা আলু। আহা অমন সুন্দর ঝাঁপানো সবুজ পাতা, মাটির ভেতরে তার অমন পুরুষ্ট সব রাঙা আলু, সব ওপড়ানো ছড়ানো ছিটানো পড়ে আছে। এতটুকু আলুও কোথাও নেই!

রাগে দুঃখে ভগবান তো মাথার চুল ছিঁড়তে বসেন আর কি! তারপরই চোখে পড়ল

খেতময় ইয়া ইয়া পায়ের ছাপ। হাঁক মারলেন, ওরে লেগবা, দেখ এসে। খেত ভৱিতি কার পায়ের ছাপ। নিশ্চয়ই সেই চোর ব্যাটার। ডাক, সব মানুষজনকে ডাক। যার পায়ের সঙ্গে এই ছাপ মিলবে তারই নির্ধাত এই কীর্তি। বড়ো বাড় বেড়েছে এরা। দেখাচ্ছি মজা। রাগে খেত থেকে ফিরে ভগবান দাওয়ায় বসে পড়লেন। নাওয়াখাওয়া মাথায় উঠল। আগে চুরির একটা বিহিত করতে হবে। তারপর অন্য কাজ।

লেগবার ডাকে মানুষরা সব হাজির। ভয়ে তারা জড়সড়। যদি কারো পায়ের সঙ্গে এই ছাপ মিলে যায় তাহলে নাজানি কী ভয়ংকর শাস্তি লেখা তাদের সকলের কপালে। ভগবানের রাগ বলে কথা। কাঁপতে কাঁপতে একজনের পর আর একজন পা রাখে ছাপের ওপর। নাঃ, কারোর সঙ্গে ছাপটা পুরোপুরি মেলে না। একে একে মানুষরা সব স্বষ্টির নিষ্পাস ফেলে।

কিন্তু চোর তাহলে কে? ভয় কমে গিয়ে সকলেরই খুব কৌতুহল হয়েছে। পায়ের ছাপগুলো খুব মন দিয়ে দেখে। হঠাৎ একজন বলে বসল, কী বড়ো বড়ো পায়ের ছাপ! কোনো মানুষের পা কি এত বড়ো হতে পারে? অমনি আর পাঁচজন মাথা নেড়ে গন্তব্য মুখে সবজাতার মতো বলে, ঠিক কথা, হক কথা। এ তো মানুষের পায়ের ছাপ নয়। অন্য কারো। তবে কি লেগবার? তারা লেগবাকে ধরে। নির্বিকার মুখে লেগবা ছাপের ওপর পা রাখে। সবাই দেখে, মিলল না। নাঃ লেগবাও নয়। তাহলে পায়ের ছাপ কার?

ভগবান তো এসব দেখেশুনে হতভন্ত। জিজ্ঞাসা করলেন, মানুষের পায়ের ছাপ নয়। লেগবার পায়ের ছাপ নয়, তো কার পায়ের ছাপ? এ পৃথিবীতে দু-পায়ে মাটিতে হাঁটতে পারে এমন আর কে আছে?

সবাই এর ওর মুখ চাওয়াওয়ি করে। মুখ ফুটে স্পষ্ট কেউ কিছু বলে না। নিজেদের মধ্যে চলে গুজগুজ ফুসফুস। তখন মাথা চুলকোতে চুলকোতে খুব বিনয় সহকারে লেগবা বলল, প্রভু যদি অধীনের অপরাধ না নেন, তো একটা কথা বলব?

ভগবান চুরি রহস্যের কিনারা চান। হুকুম দিলেন, বল কী বলবি।

লেগবা খুব মিষ্টি গলায় বলে, প্রভু দেখছেন তো, কাউকে পরীক্ষা করা বাকি নেই। ছাপের সঙ্গে কারো পা-ই মিলছে না। কিন্তু চুরি তো হয়েছে। রাঙ্গা আলুগুলো নেই। কেউ তো নিশ্চয় নিয়েছে। তাই বলছিলাম কি, মানে যদি কিছু মনে না করেন, আপনি নিজে একবারটি ছাপের ওপর দাঁড়াবেন?

লেগবার কথা শুনে ভগবান তো রেগে গেলেন। কি! যত বড়ো মুখ নয় তত বড়ো কথা। আমি নিজে রাঙ্গা আলু তুলে লোকের নামে দোষ দিচ্ছি! তোরা আমাকে ভাবিস কী। আমি না ভগবান!

লেগবা ঠিক তেমনি শান্ত গলায় বলে, রাগ করবেন না প্রভু, আমরা সামান্য জীব। আপনার দয়াতে আমাদের জন্ম। তবে বলছিলাম কি, এমন তো হতে পারে রাতে ঘুমের ঘোরে উঠে এসে আপনি নিজে হাতে রাঙ্গা আলুগুলো তুলে কোথাও সাবধানে রেখে দিয়েছেন তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন—তাই মনে নেই।

ভগবান আরও চটে গেলেন, বলি আমি কি মানুষ যে, নিজের অজ্ঞতে কাজ করব? ওসব
করে মানুষরা। তারা জেগে থাকা অবস্থায় যা করতে পারে না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তার স্ফপ দেখে।
কখনো কখনো ঘুমন্ত অবস্থায় তা করেও ফেলে। ওটা একটা রোগ। আমি স্বয়ং ভগবান,
সর্বশক্তিমান, আমি যখন যা ইচ্ছে করতে পারি। আমার রোগটোগ হয় না। দেখ লেগবা, বাজে
প্রহসন করিস না। তোরা আমাকে সন্দেহ করছিস তো? ঠিক আছে।

গজগজ করতে করতে ভগবান দাওয়া থেকে নেমে এলেন, তবে এই দেখ, কেমন আমার
পায়ের সঙ্গে চোরের ছাপ মেলে!

দুমদাম করে যেই না ছাপের ওপর ডান পাটি ফেললেন, অমনি পায়ের সঙ্গে ছাপ মিলে
গেল। গজরাতে গজরাতে বাঁ পাটিও ফেললেন অন্য ছাপের ওপর। সে পা-টিও ছাপের সঙ্গে
হুবহু মিলে গেল। ভগবান হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে। দুই পা দুই ছাপে পুরো মানুষজন
চিঢ়কার করে উঠল, ওরে ভগবান নিজেই চোর, নিজেই চোর।

ছাপের পিছু পিছু সবাই জঙ্গলে গিয়ে রাঙ্গা আলুর বস্তা পৌঁতা ঢিবিটায় পৌছোয়। দেখতে
দেখতে রাঙ্গা আলু সব বেরোল। ভগবান তো হেনস্থার একশেষ। তাঁরই হাতে তৈরি সামান্য



মানুষের কাছে তাঁর মাথা হেঁট। মানুষজনের হইহল্লা হাসিঠাটায় খানিকক্ষণ হতবাক হয়ে রইলেন।
তারপর কোনোরকমে রাগ দুঃখ লজ্জা সামলে বললেন, তোদের মতো নেমকহারাম প্রাণীদের
নিয়ে আমার একসঙ্গে থাকাটাই ভুল। আর আমি তোদের নাগালের মধ্যে থাকব না।

মাটির পৃথিবী ছেড়ে এরপর ভগবান চলে গেলেন বহু বহুদূর। সেই থেকে মানুষ থাকে
মর্তে, আর ভগবান থাকেন ওই ওপরে স্বর্গে। তাদের মধ্যে আর সম্পর্ক নেই।

ଏ ଶୋ ଆମାଦେଇ ମେଯେ

ବହୁକାଳ ଆଗେ ଆମାଦେର ଏହି ପୃଥିବୀ ଭାରୀ ଅନ୍ଧକାର ଅନ୍ଧକାର ଛିଲ । ଦିନେର ବେଳାତେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋ ସରାସରି ଆସନ୍ତ ନା । ରାତରେ ଆକାଶ ତୋ ମିଶମିଶେ କାଳୋ । ଗାଛପାଲାୟ ଛିଲ ନା ସବୁଜେର ଜଳୁସ । ପଶୁପାଖି ମାନୁଷଜନ ସବ କେମନ ମନମରା । କାରୋ ମୁଖେ ହାସି ନେଇ । ନେଇ ଗାନ । କିଛୁଇ ଭାଲୋ ଲାଗେ ନା । ତାଇ ବୋଧ ହୁଯ ହଠାତ୍ ମାଟିର ଏକ ମେଯେ ଗୋ ଧରେ ବସଲ, ସେ ବିଯେ କରବେ ନା । ଏଦିକେ ତାର ବାବା-ମା ପାତ୍ର ଠିକ କରେ ଫେଲେଛେ । ଆଗାମୀକାଳ ବିଯେ ! ଜିନିସପତ୍ର କେନାକାଟା ଆରୋଜନ-ଟାରୋଜନ ସବ ଶୈଁ । ଏଥିନ ଜେଦି ମେଯେ କିନା ବେଁକେ ବସେଛେ ।

ବାବା ମା କତ ବୋକାଯ, ସୋନାର ଟୁକରୋ ଛେଲେ, ଦିବିୟ ସୁଖେ ସ୍ଵଚ୍ଛନ୍ଦେ ଥାକବି । କିଛୁଇ କଷ୍ଟ ହବେ ନା । କିନ୍ତୁ ମେଯେ କିଛୁତେଇ ରାଜି ହୁଯ ନା । କୀସେ ତାର ଆପଣି ଜିଜ୍ଞାସା କରଲେ ଅନେକକଣ ଚୁପ କରେ ଥିକେ ଜାନାଯ, ଇଚ୍ଛେ କରଛେ ନା ବିଯେ କରତେ । ବାବା ଚଟେମଟେ ବଲେ, ଖେଯାଲିପନା ରାଖ । କବେ ତୋର ମନ କରବେ ତାର ଜନ୍ୟ ପାନ୍ତର ବସେ ଥାକବେ । କାଲାଇ ତୋର ବିଯେ, ବ୍ୟସ ।



মেয়ে মুখে কিছু বলল না বটে কিন্তু ভয় পাবার পাত্রী সে নয়। সে ভেবেটোবে ঠিক করে ফেলে অগত্যা কী করা। বিয়ের দিন ভোর থেকে বাড়িতে হইচই, কাজকর্মে সাজানো গোছানোয় সবাই ব্যস্ত। কোন ফাঁকে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে কনে পোলিয়ে যায়। গাঁ পেরিয়ে সোজা জঙ্গলে। বাড়ির লোক টের পেয়ে খোঝাখুঁজি করতে এসে পাছে ধরে ফেলে, এই ভয়ে সে বেপরোয়া হয়ে দৌড়োতে থাকে বনের মধ্যে। রাস্তা তো নেই। গাছপালা ঝোপঝাড় এদিক-ওদিক করে পেরিয়ে যাচ্ছে তো যাচ্ছে। শেষে দেখে ছোটো একফালি-মাঠের মতো জায়গা। চারিপাশে বনের ঝাঁকড়া গাছগাছালির দেওয়াল।

বাং বেশ সুন্দর তো! এতক্ষণ দৌড়ে হাঁফ ধরে গিয়েছে। একটু আরাম করে বসতে যাবে, হঠাৎ দেখে শূন্য থেকে ঝুলছে ইয়া মোটা একটা দড়ি। একেবারে তার হাতের নাগালের মধ্যে। ভারী কৌতুহল হল মেয়েটির। দেখাই যাক না ব্যাপারটা কী। দড়িটা যেই না দু-হাতে চেপে ধরেছে অমনি সাঁ করে তাকে সুন্দু দড়িটা ওপরে উঠতে লাগল। উঠছে তো উঠছেই, উঠছে তো উঠছেই।

মেয়ে তো ভয়ে কাঠ। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখে গাছপালা পাহাড়পর্বত নদীনালা খেত-খামার ক্রমেই ছোটো হতে হতে মিলিয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর আর কিছু নেই। খালি ধোঁয়া ধোঁয়া মেঘ। ভয়ে চোখ বন্ধ করে প্রাণপণে দড়িটা আঁকড়ে ধরে থাকে। হঠাৎ দুম করে এক ধাক্কা! চোখ মেলে দেখে সে পড়ে আছে এক বনের ধারে। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায় সে। দূরে ছবির মতো একটা শহর। অবাক হয়ে চেয়ে থাকে মেয়ে। যেন এক অন্য জগৎ। এতটুকু মাটি নেই কোথাও। সব শানবাঁধানো নিরেট মসৃণ। বকবাকে তকতকে। গাছপালাগুলো মনে হয় পাথরে কুঁদে কে গড়ে রেখেছে। আর চারিদিকে কী তীব্র আলো! মাটির মেয়ের তো পৃথিবীর ছায়া-ছায়া অন্ধকারে বাস করা অভ্যেস। তার চোখ একেবারে ধাঁধিয়ে যায়। বসে পড়ে কতক্ষণ চোখ বুজে থাকে সে।

এদিকে সন্ধে হয়ে আসে। সুয়িঠাকুরের মা ইঁটতে বেরিয়ে শহরের সীমানা ছাড়িয়ে যেতে যেতে দেখেন পথের ধারে পারিজাত বনের ছায়ায় শুকনো মুখে এক ফুটফুটে মানুষের মেয়ে। দেখে তাঁর যেমন ভালো লাগল তেমনি হল মায়া। কাছে গিয়ে থুতনি ধরে আদর করে শুধালেন, আহা, তুমি কাদের বাড়ির মেয়ে বাছা? এমন লক্ষ্মীমন্ত রূপ, ভর সন্ধেয় একলাটি এখানে বসে?

মেয়েটি বয়সে কাঁচা হলেও বুদ্ধিসুন্ধিতে ছিল পাকা। ভাবল, বিয়ের আসর থেকে পালানোর কথাটা না বলাই ভালো। গলায় আঁচল দিয়ে সুয়িঠাকুরের মাকে টিপ করে প্রণাম করল সে। তারপর বলল, মা আমি বড়ো দুঃখী। আমার কেউ নেই। ঘুরতে ঘুরতে এখানে চলে এসেছি। কাউকে চিনি না, জানি না। তাই কোথায় যে যাব কিছু ঠাওর করতে না পেরে এখানে চুপ করে বসে আছি।

সুয়িমা তখন বললেন, বেশ তো, তুমি আমার সঙ্গে চলো না। ওই যে দূরে দেখছ স্বর্গ, ওখানে আমার বাড়ি। সেখানে মেয়ের মতো থাকবে। আমার তো থাকার মধ্যে সবেধন নীলমণি

একটি ছেলে। তার নাম সুয়িয়। দেবতাদের মধ্যে সে ভারী একজন কেউকেটা। আমার বড় শখ
একটা মেয়ের। তোমাকে আমার খুব মনে ধরেছে। তোমার সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে দিয়ে
তোমাকে আমার কাছে রাখব।

শুনে তো মেয়েটির মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। এ কী জ্বালা! বিয়ের হাত থেকে রেহাই
পাবার জন্য সে বাবা মা বাড়ির পৃথিবী সব ছেড়ে পালিয়েছে। এখন স্বর্গে এসে কিনা সেই
বিয়েরই ফাঁদে পড়তে হবে। হলই বা দেবতা বা স্বয়ং সুয়িয়ঠাকুর। বিয়ে তো! তার তো বিয়েতেই
মন নেই। এতসব ভাবনা চিন্তা তার মাথায় এল বটে কিন্তু মুখে কিছুটি বলল না। সুয়িয়া ছাড়া
স্বর্গে তার উপায়টা কী। বিদেশ বিভুঁই বলে কথা। মাথা গেঁজবার একটা ঠাই তো আপাতত চাই।
তা ছাড়া খিদেয় পেট চঁচো করছে। পরে সুযোগ বুঝে পিটটান দিলেই হবে। অতএব মুখে হাসি
টেনে সে বলল, মা আপনার সংসারে আমাকে ঠাই দেবেন সে তো আমার পরম সৌভাগ্য।
তবে আমি পৃথিবীর সামান্য মেয়ে, আমি কি আর স্বর্গের দেবতার যোগ্য?

সুয়িয়াও কম চালাক নন। এমন সুন্দর মেয়েকে তিনি ঘরের লক্ষ্মী করবেনই। মিষ্টি হেসে
বলেন, বেশ তো বাছা, তুমি আমার বাড়িতে এসে আগে কদিন থাকো তো। তোমাকে আমি
জোরজবরদস্তি কিছু করব না। আমার ছেলের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হোক। দেখবে সে
দেবতাদের সর্দার হলে কি হয়, এমন ভালো মন, এমন নরম স্বভাব তুমি পৃথিবীর মানুষের মধ্যে
মোটেও দেখনি।



মাটির মেয়েকে হাত ধরে নিয়ে তো সুষ্যিমা বাঢ়ি এলেন। কত ভালোমন্দ রান্না হল তার জন্য। সোনার থালায় সাজিয়ে কত যত্নে আদরে খাওয়ালেন। সুন্দর রেশমি শাড়ি, হিরে জহরতের গয়নায় দিলেন তাকে সাজিয়ে। তারপর বললেন, যাও তো মা, বাগানে একটু বেড়িয়ে এসো। আমার ছেলে সুষ্যি সেখানে আছে। আলাপ-সালাপ হবে। দেখো, তার আগুনের মতো টকটকে লাল রং দেখে যেন ভয় পেয়ো না।

এদিকে ছেলে সুষ্যিকেও বলে কয়ে বাগানে পাঠান। দেখ গিয়ে মাটির মেয়ের কী রূপ, কী লাবণ্য। কী কোমল তার চোখের চাউনি। স্বর্গের দেবীগুলো তার পাশে তো কাঠের পুতুল। মার কথায় সুষ্যি যেই বাগানে চুকেছেন, তাঁর প্রচণ্ড আলোর ছটায় চারিদিক যেন ঝলসে গেল। মাটির মেয়ে তো ভয়ে চোখ ঢাকে দু-হাতে। সুষ্যি তার সঙ্গে কথা বলেন। সে কোনো উন্নত দেয় না। মুখ নিচু করে খালি বসেই থাকে। একা একা খানিকক্ষণ কথা বলে সুষ্যিঠাকুর ঘরে ফিরে আসেন। কিন্তু তিনি হাল ছাড়েন না। মেয়েটি সত্যি বড়ো অপরূপ। তাঁর পরম মেহের পাত্র চাঁদকে পাঠান কনের মুখে কথা ফোটাতে। কিন্তু মেয়ে চাঁদের আলো দেখেও মুখ খোলে না। পর পর কত সঙ্গীসাথি নক্ষত্র তারা পাঠালেন সুষ্যিঠাকুর। কিন্তু কারো সাধ্য হল না ওই একফোটা মেয়ের মুখ থেকে এতটুকু আওয়াজ বের করে।

তখন সবাই সলাপরামর্শ করে সুষ্যিকে বললেন, আর্যদেব আমরা তো সব খালি হাতে গিয়েছি, তাই আমাদের বউঠাকুরনের মুখ ভার। তখন সুষ্যি ভাবতে বসলেন কী দেবেন তাঁর কনেকে। পৃথিবীর মেয়ের নিশ্চয়ই পৃথিবীর জিনিসই ভালো লাগবে। এই ভেবে সুষ্যিঠাকুর পৃথিবীতে যা যা ফলে তার সব কিছু থেকে একটু একটু করে নিয়ে এক বিরাট তত্ত্ব সাজিয়ে পাঠালেন।

সে একটা ধূম বটে। চাঁদ আগে আগে। পেছনে তারার দল। একের পর এক সব জিনিস নিয়ে রাখে মাটির মেয়ের সামনে। মেয়ে কিন্তু এক পলক দেখেই মুখ ঘুরিয়ে নেয়। তার মুখ ভারই রয়ে যায়। পৃথিবীর কোনো জিনিসেই পৃথিবীর মেয়ের মন ওঠে না। শেষে অনেক মাথাটাথা ঘামিয়ে সুষ্যি নিজেই হাজির হন। সঙ্গে তাঁর এক বিশেষ উপহার। একটি সোনার হাঁড়িতে তাঁর নিজের আলো। কনের সামনে রেখে তিনি নিজে আড়ালে গিয়ে দাঁড়ান। মাটির মেয়ে এদিক-ওদিক চেয়ে ইতস্তত করে আস্তে আস্তে হাঁড়ির ঢাকনাটা খোলে। ব্যস, চারিদিক একেবারে সোনায় সোনা।

এইবার মেয়ের মুখে ফুটল হাসি। বলে উঠল, বাঃ কী সুন্দর! অমনি সুষ্যির বাড়িতে শোরগোল পড়ে গেল। কনে কথা কয়েছে, কনে কথা কয়েছে। কেউ বা নিয়ে এল সুগন্ধি তেল, কেউ বা বসে গেল প্রসাধনের সাজসরঞ্জাম নিয়ে। সুষ্যিমা নিজের হাতে তার সর্বাঙ্গে পরিয়ে দিলেন রক্তের মতো লাল চুনির গয়না। শুভলগ্নে স্বর্গের দেবতার সঙ্গে পৃথিবীর মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল।

সুখে শান্তিতে তাদের দিন কাটে। তিনটি ফুটফুটে ছেলে হল। বাপের মতো তাদেরও গায়ের রং আগুনের মতো। অর্থচ মুখেচোখে মায়ের মাটির লাবণ্য।

এদিকে সুয়িবউয়ের সব সুখের মধ্যে যে একটি ছোট কাঁটা রয়ে গেছে। মাঝেমাঝেই মনে পড়ে ফেলে আসা পৃথিবী আর বাবা-মা-ভাই-বোন সকলের কথা। স্বর্গে সে আছে কত আরামে। সূর্যের আলো সদাই তাকে নরমেগরমে ঘিরে রাখে। অন্যদেরও। তাই সবার চোখেমুখে আনন্দ। খুশি ভালোবাসা যেন উপচে পড়ে। আর পৃথিবীতে কী ঠাণ্ডা, দিনের বেলাতেও ছায়াছায়া। কারো মুখে হাসি নেই। বাবা-মা কী কষ্টেই না থাকে। এসব কথা যতই সে ভাবে ততই তার মন খারাপ হয়। শেষে সে স্বামীকে শাশুড়িকে ধরে পড়ে, বাপের বাড়ি যাব।

প্রথমে সকলেই একটু কিন্তু কিন্তু করছিল। পৃথিবী কতদুরের রাণ্ডা। আর জায়গাটাও সেরকম কিছু ভালো নয়। একেই ঠাণ্ডা তার ওপর লোকগুলোও কেমন মনমরা। কিন্তু বউয়ের আবদারে সুয়ির কান একেবারে ঝালাপালা। এদিকে বউকে সকলেই খুব ভালোবাসে। অতএব সুয়িমা একদিন বললেন, ওরে, বউমার বাপের বাড়ি যাওয়ার বন্দোবস্ত করে দে। আহা, কতদিন বাপ-মাকে দেখেনি। মন কেমন তো করতেই পারে।

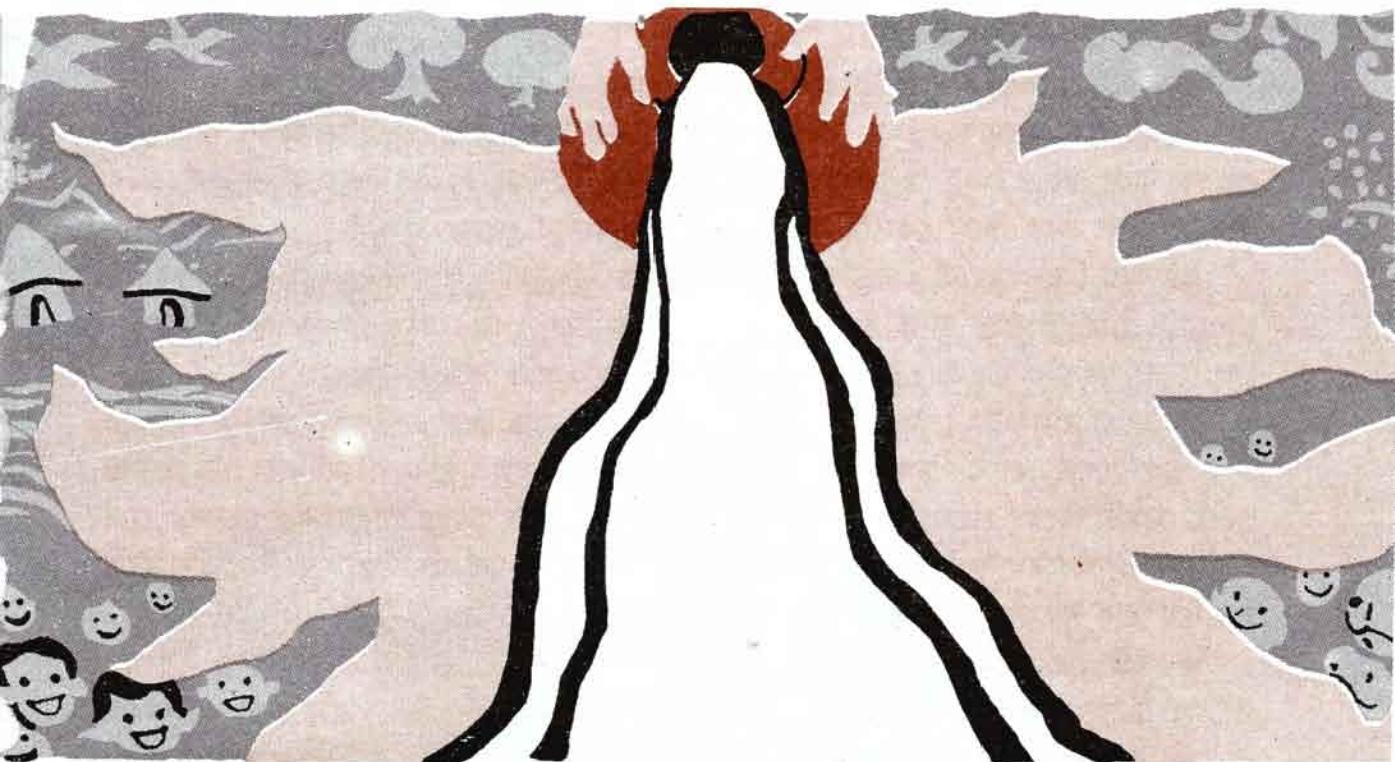
কিন্তু যাব বললেই তো সুয়িঠাকুরানির যাওয়া হয় না। এখন সে আর মাটির মেঝেটি নয়। একজন মন্ত দেবতার বউ বলে কথা। হুট করে একলা একলা যাওয়া তো চলে না। সঙ্গে থাকবে কত দাস-দাসী। বাবা-মা-ভাই-বোন আত্মীয় পরিজনের জন্য বয়ে নিয়ে যাবে উপহার উপটোকন। সুয়িবউ নিজে হাতে করে নিয়ে চলল সূর্যের আলোভরা সোনার হাঁড়িটা।

সব আরোজন শেষে সেই বিরাট লম্বা মোটা দড়িটা একদিন ঝুলিয়ে দেওয়া হল। সেটা বেয়ে বেয়ে তিন ছেলে চাকর-চাকরানি জিনিসপত্র নিয়ে নেমে এল মাটির মেঝে মাটিতে। দেখে সেই অন্ধকার অন্ধকার মাঠঘাট আদাড়-পাদাড় জঙ্গল। সব সেই একইরকম হিম হিম। বাপের বাড়ি যখন পৌছোল, সকলে তো বিস্ময়ে হতবাক। তারা ধরেই নিয়েছিল তাদের অবাধ্য মেঝেটা হারিয়ে গেছে বনে-বাদাড়ে। কোনো না কোনো জানোয়ারের পায়ের থাবায় কি মাথার শিঙে প্রাণটা তার গেছে। হয়তো বা কারো পেটেই গেছে অমন সুন্দর মেঝেটা। এত বছর বাদে সেই মেঝে কিনা জলজ্যান্ত তাদের সামনে হাজির। শুধু তাই নয়, শাড়ি গয়নায় ঝলমলে কী রূপ তার! কেমন কোল আলো করা তিনটি ছেলে। কত দাস-দাসী ধনরত্ন! বাবা-মার তো খুশি আর ধরে না। তাদের মেঝে তো একেবারে রাজরানি। বাড়িতে ভালোমন্দ খাওয়াদাওয়া, হইচই আনন্দ, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব ডাকাডাকির ধূম পড়ে গেল।

সুয়িঠাকুর বউকে ছেড়েছেন মোটে তিনদিনের জন্য। দেখতে না দেখতে দিন কটা হুস করে কেটে গেল। মাটির মেঝে চোখের জল মুছতে মুছতে স্বামীর ঘরে ফেরবার জন্য পা বাড়ায়।

স্বর্গে ফেরবার জন্য সুয়িবউ সেই লম্বা মোটা দড়িটা ছোঁয়ামাত্রই সাঁ করে ওপরে পৌছে যায় সে। স্বর্গে পা ফেলেই সুয়িবউয়ের মনে পড়ে। ওই যাঃ বড় ভুল হয়ে গেছে তো! সোনার হাঁড়িতে বন্ধ সূর্যের আলো যেমনটি নিয়ে গিয়েছিল তেমনটিই সে ফিরিয়ে এনেছে। কত শখ ছিল, বাপের বাড়ির সবাইকে দেখাবে এমন অপূর্ব জিনিস। তা আর হল কই। এই তিনদিনের হট্টগোলের মধ্যে বেমালুম ভুলেই গেল এসব কথা। এখন ফিরে এসে কী আপশোস। আহা,

এমন জিনিসটা দেশের কাউকে দেখাতে পারলাম না। হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। এক কাজ করলে হয় না, হাঁড়িটার ঢাকনা খুলে একটুখানি যদি আলো ফেলে দেওয়া যায়, নিশ্চয় নীচে মাটিতে গিয়ে পড়বে। আর সবাই দেখতেও পাবে। ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি ঢালতে গিয়ে সুয়িবউ পুরো হাঁড়িটাই উপুড় করে ফেলল। অমনি—



সমস্ত পৃথিবী সোনার মতো আলোয় ঝলমল করে উঠল। কোথায় গেল গা কনকনে ঠাণ্ডা আর ধোঁয়াধোঁয়া কুয়াশা! মানুষের মুখে ফুটল হাসি। পাখি উঠল গান গেয়ে। রোদ পোহাতে দলে দলে বেরোল বনের জীবজঙ্গ। ফুলে ফুলে লাগল রঞ্জের ছোঁয়া।

সুয়িঠাকুর ওপর থেকে দেখলেন, তাই তো! পৃথিবীর সকলেরই তাঁর আলো বড় দরকার। আরও দেখলেন যে মাটির মেয়ে স্বর্গে এত সুখের মধ্যেও মাটির প্রতি তার ভালোবাসা হারায়নি। বউয়ের মুখ চেয়ে তিনি ঠিক করলেন দিনের বেলা যেমন তাঁর আলোয় পৃথিবী আলোময়, রাতের বেলায়ও একটা ব্যবস্থা তিনি করবেন। পাঠালেন চাঁদ ও তারাদের। ঘুচল পৃথিবীর রাতের অন্ধকার।

সেই থেকে এই পৃথিবীতে ভোর হয়, দুপুর গড়িয়ে আবার আসে রাত। আর দিনের উভাপে, রাতের শীতলতায় এবং নতুন নতুন প্রাণপ্রাচুর্যের বন্যায় মিশে থাকে সেই মাটির মেয়ের কোমল মমতা মাখানো স্পর্শটুকু—সংগোপনে।

অতিবৃদ্ধির গলায় দড়ি

জানো তো, খরগোশ খুব চালাক। যেমন ছটফটে তার পা, তেমনি চুলবুলে তার স্বভাব। একবার তার কী খেয়াল হল। জলহস্তীর কাছে গিয়ে বলল, হুঁ হুঁ তুই আর এমন কী। জানিস আমার গায়ে তোর চেয়ে তের বেশি জোর?

শুনে তো জলহস্তী হাসবে কি কাঁদবে বুঝতে পারে না। বলে, কি! এতটুকুন জন্ম খরগোশ। তার কিনা এমন দেমাক, এমন বাড়াবাড়ি। সে উত্তর দিল, যা যা। মেলা বকিস না। আমি জলহস্তী মনে রাখিস। এই দেখ আমার কত বড়ো হাঁ। এই এক হাঁ-তে তোর মতো এক ডজন খরগোশ কপ করে গিলে ফেলতে পারি। যা, পালা এখান থেকে।

খরগোশ কিন্তু মোটেই ঘাবড়াবার পাত্র নয়। সে দিব্য হাসি মুখে বলল, বারে, এর মধ্যে আবার খাওয়া-টাওয়ার কথা এল কোথেকে? আমি তো বলছি শ্রেফ গায়ের জোরের কথা। বেশ তো, তোমার যদি অতই গুমোর, এসো না একটা শক্তি পরীক্ষা হোক।

শুনে তো জলহস্তীর গোল গোল চোখ আরও গোল হয়ে গেল। শক্তি পরীক্ষা! সে আবার কী? খরগোশের তো খুব মজা। বলে, এই তো তোমাকে নিয়ে মুশকিল। যেমন বিরাট তোমার শরীর তেমনি নিরেট তোমার মাথা। শক্তি পরীক্ষা কাকে বলে বুঝতে পারছ না? তোমার আর আমার মধ্যে খবরের কাগজে যাকে প্রতিযোগিতা বলে—তাই হবে। যে হারবে তাকে মেনে নিতে হবে যে তার গায়ের জোর অন্যের চেয়ে কম।

জলহস্তী তো মনে মনে ভারী অপ্রস্তুত। কিন্তু মুখে ঝাটপট সামলে নিয়ে বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ পরীক্ষা-টরিক্ষার কথা আমি সব জানি। আমি কি খবরের কাগজ পড়ি না মনে কর? এখন ওই কী যেন বললে, প্রতিযোগিতা না ফ্রিয়োগিতা, সেটা ঠিক কীভাবে হবে ঠিক করো তো বাপু। তারপর দেখি কার গায়ে কত জোর।

খরগোশ তো নদীর তীর থেকে দৌড়ে জঙ্গলে গিয়ে হাজির। সেখানে বেছে বেছে খুব শুকনো শক্ত লতা জমা করল। তারপর সেগুলো দিয়ে বেশ মোটকা একটা দড়ি বানিয়ে ধীরেসুস্থে চলল বনের আর এক প্রান্তে। সেখানে থাকে এক গণ্ডার। খরগোশ তার কাছে গিয়ে সেলাম ঠুকে বলল, এই যে গণ্ডার দাদা, কী খবর? তোমার তো দাদা বিশাল শরীর। তার ওপর নাকের ডগায় ওই সাংঘাতিক খাঁড়ার মতো শিং। আচ্ছা, বলোতো দেখি তোমার চেয়ে বেশি গায়ের জোর এ জঙ্গলে কার আছে?

গণ্ডার তো সগর্বে তার খাঁড়া নাচিয়ে উত্তর দিল, হুঁ হুঁ কী বললি? এই জঙ্গলে আমার চেয়ে বেশি জোর কার? তোর কি সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে?

খরগোশ একটু হেসে বলল, শুধু সন্দেহ কেন, আমার বিশ্বাস তুমই সবচেয়ে শক্তিশালী তোমার ওই ধারণাটা ভুল। এ জঙ্গলে আমার চেয়ে শক্তিশালী আর কেউ নেই। আমার সঙ্গে গায়ের জোরের পরীক্ষা করে দেখতে পার।

তুই আমাকে হাসালি। নিজে তো একটা পঁচকে জানোয়ার। এক থাবড়া দিল শেষ হয়ে যাবি।
তোর সঙ্গে আবার গায়ের জোরের পরীক্ষা কী? যা যা আমার সময় নষ্ট করিস না। মেলা কাজ
আছে আমার। ভাগ এখান থেকে।

ভারী নিরীহ গোবেচারা মুখ করে খরগোশ আবার বলে, আমার কিন্তু মনে হয় গণ্ডারদাদা,
তোমার চেয়ে আমারই গায়ের জোর বেশি। শুনে তো গণ্ডার একেবারে অশ্বিশর্মা। খরগোশকে
এই মারে তো সেই মারে।

ঝটাপট দড়িখানা খরগোশ গণ্ডারের থাবার সামনে বাগিয়ে দিয়ে বলে, আচ্ছা, চটছ কেন?
এসো না একটা কমপিটিশান হয়ে যাক।

গণ্ডার যদিও কমপিটিশান কথাটার মানে বুঝতে পারল না। কিন্তু মুখে সেটা ভাঙল না। বরং
গন্তীরভাবে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ একটা কমপিটিশান হোক না।

খরগোশ তো মহাচতুর। গণ্ডারদাদার বিদ্যেবুদ্ধির দৌড় তার জানা। মুচকি হেসে বলে, এই
যে কী করতে হবে আমি ভালো করে বুঝিয়ে দিচ্ছি। তুমি এই দড়িটার এই দিকটা ধরে টানো,
আর আমি অন্য দিকটা ধরে টানি। আমি খুব জোরে টানব, তুমিও খুব জোরে। দুজনেই খু-ব
জোরে। তারপর এই টানাটানিতে কী হবে বল তো? যার গায়ে জোর কম সে নির্ধাত পড়ে যাবে।
ব্যস, অমনি সে হেরে গেল।

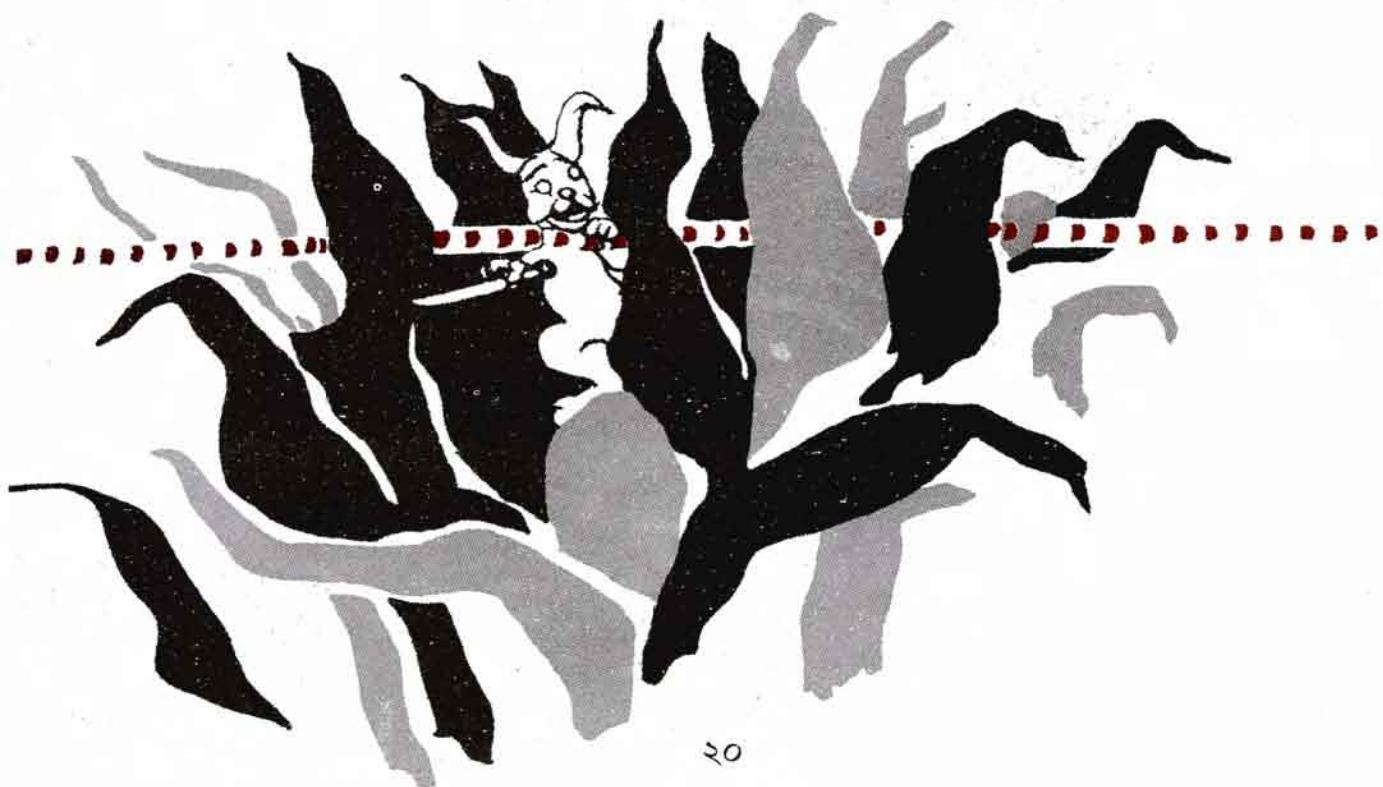


গঙ্গার তো তক্ষুনি খপ করে দড়িটার মাথা ধরে নিয়ে রেডি। ইয়া লম্বা দড়িটার অন্য মাথাটা নিয়ে খরগোশ বন পেরিয়ে সোজা জলহস্তীর কাছে হাজির। তাকে বলল, এই যে জলহস্তীদাদা, এইবার আমাদের প্রতিযোগিতা শুরু। দড়িটা ধরে টানো দেখিনি। আমি অন্য দিকটা ধরে টানছি। যত জোরে পার। প্রাণপণে। পড়ে গেলে কিন্তু হার, মনে থাকে যেন। বলেই হাওয়া।

জলহস্তী তো দড়িটা তুলেই মারল এক প্রচণ্ড টান। শুরু হয়ে গেল গঙ্গার আর জলহস্তীর মধ্যে দড়িটানাটানি। ওদের মাঝখানে ঘন জঙ্গল। জলহস্তী দেখতে পায় না গঙ্গারকে। গঙ্গার জানে না বনের ওধারে জলহস্তী। দুজনেই প্রাণপণে টানছে আর তাজ্জব হয়ে ভাবছে, আরে, ব্যাটা পুঁচকে খরগোশের গায়ে এত জোর।

খরগোশ এদিকে চুপটি করে জঙ্গলের ভেতর দড়ির মাঝবরাবর লুকিয়ে বসে। তাকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না। টানাটানি করতে করতে গঙ্গার আর জলহস্তী দুজনেই যখন একেবারে মরিয়া, তখন খরগোশ বাবাজি মাঝখান থেকে ধ্যাচাত করে দিল দড়িটা কেটে। অমনি দড়াম করে চিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল গঙ্গার। ঝপাস করে জলে ডুবে গেল জলহস্তী।

এক দৌড়ে গঙ্গারের কাছে গিয়ে খরগোশ দেখে গঙ্গারদাদা আস্তে আস্তে গায়ের ধূলোটুলো ঝেড়ে উঠে দাঢ়াচ্ছে। খরগোশ জিভটা তালুতে লাগিয়ে চুকচুক করে বলল, আহা ষাট ষাট। পড়ে গেলে গঙ্গারদাদা! খুব লাগল নাকি? যাহোক দেখলে তো কার গায়ে বেশি জোর।



বলেই এক দৌড়ে চলে গেল জলের ধারে। তখন নাকে মুখে চোখে জল ঢুকে খাবি খেয়ে জলহস্তী কোনোরকমে জল থেকে মাথা তুলছে। কাঁদো কাঁদো মুখ করে খরগোশ তাকে বলল, আহা ভারী নাকানি-চোবানি খেলে গো। যাইহোক দেখলে তো কার গায়ে বেশি জোর!

এরপর থেকে জলহস্তী আর গঙ্গার দুজনেই খরগোশকে খুব মান্যগন্য করে চলে। এতটুকু প্রাণীর কাছে গোহারা হেরে তাদের ভারী লজ্জা। মুখ দেখানো দায়। দুজনেই আলাদা আলাদা করে খরগোশকে বলে, দেখো ভাই, লক্ষ্মী সোনা আমার, কাউকে বোলো না যেন তোমার জেতার কথা। সবাই তাহলে আমাকে ছ্যা ছ্যা করবে।

খরগোশও দুজনকে আলাদা আলাদা করে বলে, না, না তাই কি আমি কখনো করি। হেরে গেলে কী হবে তুমি তো আমার দাদা। কিছু ভেবো না, কেউ জানবে না।

খরগোশটা কিন্তু খুব দুষ্টু ছিল। কাজেই ঠিক গুজব ছড়িয়ে যায় সমস্ত পশুসমাজে যে ওইটুকুন পুঁচকি খরগোশ দুটো ডাঙের হোমরাচোমরা জন্মকে নাকি শক্তি প্রতিযোগিতায় ঘায়েল করে দিয়েছে। জলহস্তী আর গঙ্গারের মাথা উঁচু করার জো নেই। এদিকে খরগোশের তো দেমাক খুব বেড়ে গেছে। অহংকারে মাটিতে পা পড়ে না। একদিন জলহস্তীকে ঠাট্টা করে বলে বসল, কি জলহস্তীদাদা ভালো করে খাচ্ছাচ্ছ তো? গায়ের জোরটোর একটু বাড়াও। নইলে চলবে কী করে? আমার সঙ্গে থাকতে তো হবে এ জঙ্গলে।

শুনে তো জলহস্তী রেগে আগুন। বহুকষ্টে নিজেকে সামলে মিষ্টি করে উত্তর দেয়, বেশ তো,



এক মাঘে তো আর শীত যায় না। একবার হেরেছি তো কী? আর এক বার হোক না, তোমার সেই পতিযোগিতা।

মহানন্দে খরগোশ তো আবার একটা আরও মোটা আরও লম্বা দড়ি বানাল। এবারে এ দুটো বুদ্ধুকে আরও খাটাবে, একেবারে গলদঘর্ষ করে ছাড়বে। গঙ্গারকে গিয়ে বলে, এই যে গঙ্গারদাদা পেনাম হই। তা শরীর গতিক সব ভালো? আর একবার খেলবে নাকি দড়ি টানাটানি? দেখাই যাক না গায়ের জোর তোমার একটু বাড়ল না আরও কমল।

আমাদের এই গঙ্গার বিখ্যাত ছিল তার জেদের জন্য। হেরে যাওয়ার দিন থেকে মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল সুযোগ পেলেই শোধ তুলবে। খরগোশের কথা শেষ হতে না হতে সে খপ করে দড়িটা তুলে নিল। শুরু হল টানাটানি লড়াই।

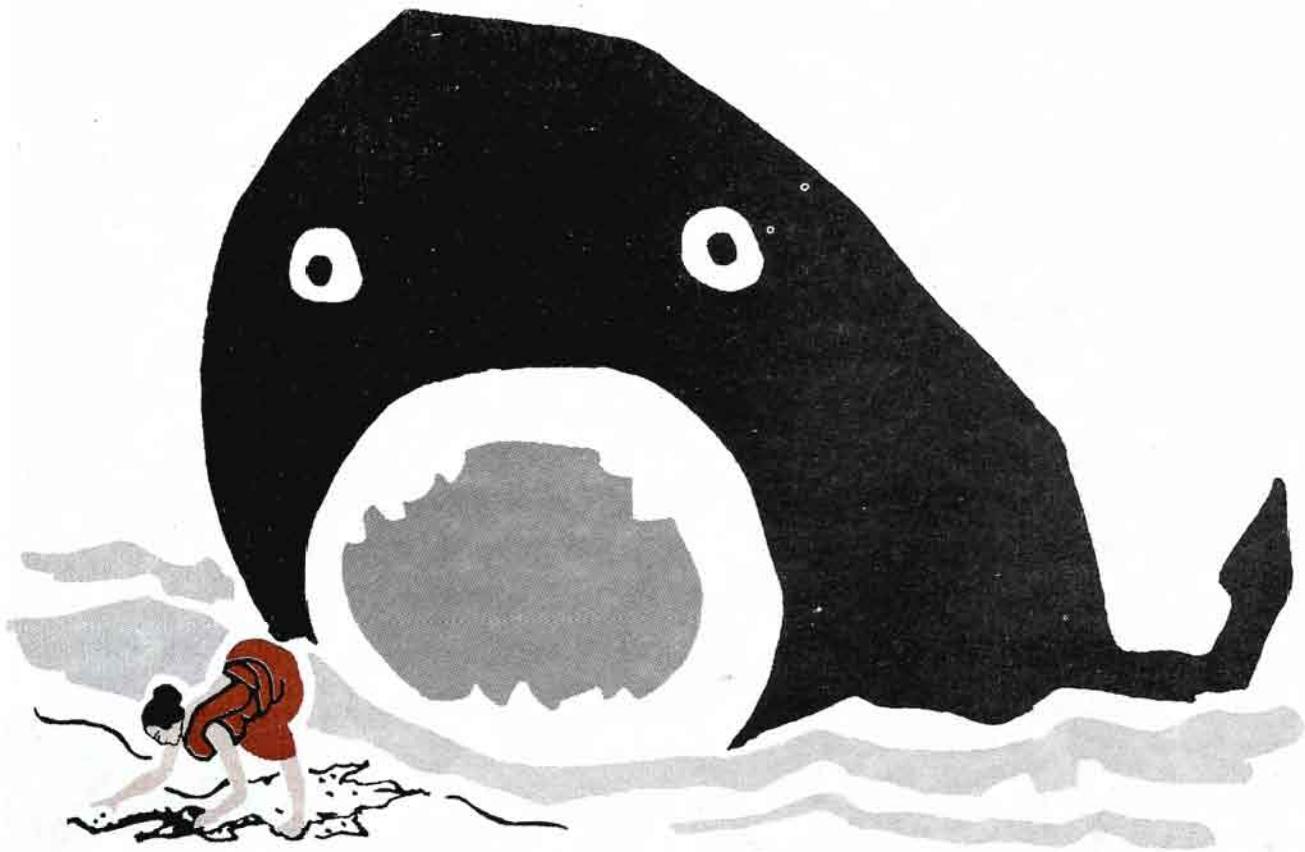
খরগোশ তো যথারীতি বনের ভেতর দড়িটার মাঝ বরাবর ঘাপটি মেরে বসে। তার মতলব হল জলহস্তী আর গঙ্গার অনেকক্ষণ ধরে টানাটানি করে যখন একেবারে খেপে উঠবে। তখন ঠিক সেবারের মতো ঘ্যাচ করে দড়িটা মাঝখান থেকে কেটে ফেলবে।

কিন্তু খরগোশের এত বৃদ্ধি থাকলে কী হবে, তোমাদের মতো ইতিহাস তো পড়েনি। জানে না একবার যা ঘটে পরের বার ঠিক তেমনটি কখনো হয় না। জলহস্তী-গঙ্গারের দড়ি টানাটানি চলছে অনেকক্ষণ। গায়ের জোরে দুজনেই সমান। কিন্তু এরমধ্যে আবার দড়ি টানাটানি করে গঙ্গারের খুব জলতেষ্টা পেয়ে গেল। সে তখন ভাবল দড়িটাকে হাতে কয়ে জড়িয়ে নিয়ে নদীতে গিয়ে একটু জল খেয়ে আসি। নদীর ধারে এসে দেখে কী কাণ্ড! কী কাণ্ড! দড়ির অপর দিকটা ধরে বসে আছে কিনা জলহস্তীভাই! খরগোশের চিহ্নমাত্র নেই। এদিকে জলহস্তীরও চক্ষু ছানাবড়া। আরে, দড়ির আর এক দিক ধরে আছে খরগোশ নয়, গঙ্গারদাদা!

এতক্ষণে দুজনেই বুঝতে পারল খরগোশের চালাকি। গঙ্গার তো চলল তার খাড়া উঁচিয়ে খরগোশের পেটটাকে এফোড় ওফোড় করবে। আর জলহস্তী বিশাল হাঁ করে খুঁজে বেড়াল খরগোশকে, পেলেই কপ করে মুখে পুরবে। জলে ডাঙায় কোথাও খরগোশের তিঠোবার উপায় রইল না। একদিন সে বন থেকে একেবারে উধাও হয়ে গেল। আর ফিরল না।



ମାନୁଷ ବନାମ ତିମି



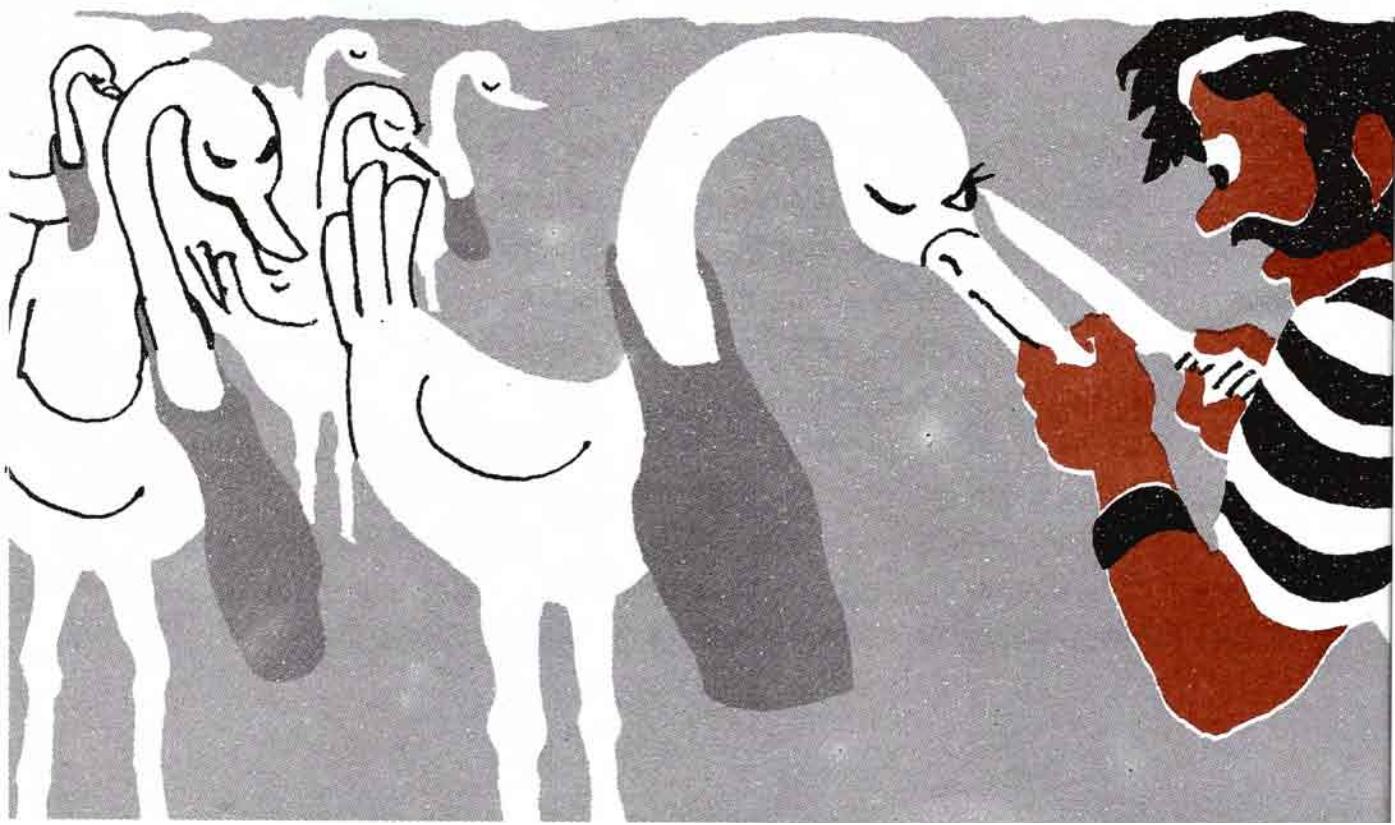
ଅନେକଦିନ ଆଗେ ସମୁଦ୍ରେର ଧାରେ ଏକ ଗାଁଯେ ବାସ କରତ ଖୁବ ସାହସୀ ଏକ ଶିକାରି । ଜଲେର ନାନା ଜୀବଜଣ୍ଠୁ ଶିକାରଇ ଛିଲ ତାର ପେଶା । ଏକବାର ସେ ମାରଲ ଏକଟା ସାଦା ଭୋଦଙ୍ଗ । ଭାରୀ ସୁନ୍ଦର ସାଦା ଚାମଡ଼ା ଭୋଦଙ୍ଗଟାର । ଶିକାରି ଭାବଳ ଚାମଡ଼ାଟା ଦିଯେ ସୁନ୍ଦର ଜାମା ହବେ । କିନ୍ତୁ ଚାମଡ଼ାଟା ଛାଡ଼ାବାର ସମୟ ଧରଥିବେ ସାଦା ଲୋମେ ଲେଗେ ଗେଲ କରେକ ଫୋଟା ରକ୍ତ । ଛୋପଲାଗା ଚାମଡ଼ାଟା ଜଲେ ଧୂଯେ ପରିଷକାର କରତେ ଦିଲ ତାର ବଟକେ । ଶିକାରିବିଡ଼ ସମୁଦ୍ରେର ଦିକେ ପିଛନ ଫିରେ ଦାଢ଼ିଯେ ଜଲେର ମଧ୍ୟେ ଚାମଡ଼ାଟାକେ ଫେଲେ ଦୁ-ପାଯେ ଚେପେ ବେଶ ସମେ ଘମେ ଦାଗ ତୁଳତେ ଶୁରୁ କରେ ଦିଲ ।

ଏମନ ସମୟ ପିଛନ ଥେକେ ହୁସ କରେ ମାଥା ତୁଲଲ ମିଶକାଲୋ ବିରାଟ ଏକ ତିମି । ଶିକାରିବିଡ଼କେ ଟପ କରେ ପିଠେ ତୁଲେ ଜଲକେଟେ ସାଂତରେ ପାଲାତେ ଲାଗଲ । ଏଦିକେ ଦୁ-ହାତେ ପ୍ରାଣପଣେ ତିମିର ଡାନା ଆଁକଡେ ଶିକାରିବିଡ଼ ଚିଂକାର ଜୁଡ଼େ ଦିଲ, କେ ଆଛ, ବଁଚାଓ ବଁଚାଓ ! ତିମିତେ ନିଲ ଆମାଯ ।

তিমিটা খুব চালাক। শিকারিবউয়ের চ্যাচামেচি শুরু হতেই সে সাঁ সাঁ করে সাঁতরে সোজা গিয়ে পড়ল মাঝা দরিয়ায়। আর সেখানে পৌছেই মারল এক ডুব। ডুব ডুব ডুব। হাজির একেবারে জলের তলায়। ব্যস নিজের রাজ্যে।

ওদিকে বউয়ের চিংকার শুনে শিকারি তো ঝটপট সড়কিবল্লম ছুরিছোরা পিঠে, কোমরে বেঁধে নিয়ে ছিপ নৌকোয় চড়ে বসেছে। যেমন করেই হোক তিমির কবল থেকে বউকে উদ্ধার করবে। সে মানুষ, তিমির চেয়ে বৃদ্ধি কি তার কম! এমন আচমকা বিপদ, এত তাড়াহুড়ো, এসবের মধ্যেও সে একজন বন্ধুকে ডেকে সঙ্গে জুটিয়েছে। দুজনে মিলে প্রাণপণে নৌকো বেয়ে তিমির পিছু পিছু ধাওয়া। মাঝসমুদ্রে এসে হঠাৎ দেখে, কোথায় তিমি! চারিদিকে জল, খালি জল। তিমির চিহ্নমাত্র নেই। যেখানে তিমি মোক্ষম ডুবটি দিয়েছে সেইখানে মাঝসাগরে শিকারি নৌকো রেখে ভাবছে কী করা যায়। এদিকে সমুদ্রে সমানে ঢেউয়ের ওঠাপড়া—তার মধ্যে নৌকো তো স্থির হয়ে থাকতে পারে না। স্বোত্তরে টানে ভেসে যেতে চায়। অতঃপর শিকারি হালটি ধরিয়ে দেয় বন্ধুর হাতে, চামড়ার লম্বা একটা দড়ি বাঁধে নৌকোর সঙ্গে। আর দড়িটার আগা নিজের কোমরের সঙ্গে কয়ে বেঁধে নিয়ে ডুব দেয় জলের মধ্যে।

ডুবছে তো ডুবছে, ডুবছে তো ডুবছে। কতক্ষণ পরে তার পায়ে ঠেকল শক্ত জমির মতো সিদ্ধুতল। সে এক অন্য জগৎ। বিচির গাছগাছালি ঝোপঝাড় রংবেরঙের নুড়ি। কত রকমারি অঙ্গুত অঙ্গুত জীবজন্ম। প্রথমেই তার সঙ্গে দেখা একদল সাগর পাখির। তাদের চেহারা অনেকটা বকের মতো, প্রত্যেকের গলায় ঝুলছে একটা থলি। মাছ ধরে ধরে থলিতে পুরে জমায়। খিদে পেলে বের করে খায়। কিন্তু বেচারাদের চোখের পাতাদুটি জোড়া। চোখ খুলতে পারে না।



একেবারে অন্ধ। ভারী মায়া হল তাদের অবস্থা দেখে শিকারির। কোমর থেকে ছুরি বের করে নিয়ে কেটে দেয় এক এক করে সকলের জোড়া পাতা। অমনি তারা চোখ মেলল। জীবনে প্রথম দেখল আলো। কার দয়াতে তাদের দৃষ্টিলাভ? সামনে তাদের এক মানুষ। ডাঙার জীব তাদের অন্ধকার থেকে বাঁচিয়েছে। তারা কলকল করে কথা বলে ওঠে। জানতে চায় উদ্ধারকর্তার বৃত্তান্ত। ডাঙার মানুষ অতল জলে কেন? সব শুনেটুনে তারা শিকারিকে তিমির রাজ্যে যাওয়ার রাস্তার সংধান বলে দিল। শুধু তাই নয়, পইপই করে সাবধানও করে দেয়, দেখো যে পথ দিয়ে যাবে সেই পথে যেন খবরদার ফিরো না। তিমির পাল বেরিয়ে পড়বে তোমাকে ধরতে। অন্য যে রাস্তা দিয়ে ফেরা যায় তার হাদিশ দিয়ে দেয় তাকে।

সাগর পাখিদের পরামর্শ মতো শিকারি তো এগিয়ে চলেছে। যেতে যেত হঠাত শোনে কে যেন ইনিয়েবিনিয়ে কাঁদছে। এদিক-ওদিক চেয়ে দেখে একটা গাছের তলায় কয়েকটা চ্যালাকাঠ নিয়ে বসে কাঁদছে একজন কাঠুরে। শিকারি তাকে জিজ্ঞেস করে, কী হে বাপু, কানাকাটি করছ কেন? ব্যাপারটা কী?

—ব্যাপার আমার পোড়া কপাল আর কি, চোখের জল মুছতে মুছতে বলে কাঠুরে। আমি তিমি রাজার রান্নাঘরে কাঠ জোগাই। কিন্তু আজকে কাঠ কাঠতে গিয়ে হঠাত কুঠারটা ভেঙে গেল। এখন কাঠ কাটি কী করে? একটা চ্যালায় তো তিমি রাজার রান্না হবে না। খিদের সময় মুখের কাছে খাবার হাজির না থাকলে কর্তা তো আমাকেই আস্ত খেয়ে ফেলবেন। এখন আমি প্রাণে বাঁচি কী করে! দেখো না ভাই, তুমি যদি কিছু করতে পার।

শিকারি আমাদের যে-সে মানুষ নয়। অস্ত্র বানাতে একেবারে ওস্তাদ। ভাঙা কুঠারের খণ্ড দুটো এমন যত্ন করে মেরামত করে ফেলল যে একেবারে নতুনের মতো ঝকঝক করতে লাগল। কাঠুরে তো মুগ্ধ। দু-হাত তুলে আশীর্বাদ করে শিকারিকে, বিঁচে থাকো বাবা বিঁচে থাকো, ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক।

সুযোগ বুঁবো শিকারি বলল, আচ্ছা একটা খবর আমাকে দিতে পার? বিরাট একটা তিমি আমার বউকে ধরে এনেছে। তুমি জানো তাকে ঠিক কোথায় নিয়ে রেখেছে?

চোখ বড়ো বড়ো করে কাঠুরে উভর দেয়, আরে এই মানুষের মেয়ের জন্যই তো আমার এই খোয়ার। তিমি রাজা নিজে তাকে ধরে এনে রান্নাঘরে রেখেছেন। আমার এই কাঠ দিয়েই তো তাকে উনোন ধরাতে হবে। তিমি রাজার ভারী শখ মানুষের মতো পাঁচ পদ রকমারি রান্না খাবেন।

শুনে তো শিকারি রেগে টৎ। এত বড়ো কথা! তার বউ কিনা একটা মাছের রাঁধুনিগিরি করবে! হলেই বা সে তিমিরের রাজা। কেন শিকারি কি তাকে দু-বেলা দু-মুঠো খেতে দেয় না, না কি মানুষ বলে তিমির সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে না? ক্ষোভে দুঃখে তার চোখ ফেটে জল আসে।

কাঠুরের ভারী করুণা হয়। আহা, বেচারা ভালো মানুষের ছেলে কী কষ্টই না ভোগ করছে

বউকে হারিয়ে। নাঃ এর জন্য কিছু করা উচিত। কাঠুরে শিকারিকে নিয়ে চলল তিমি রাজার বাড়ির দিকে। যেতে যেতে তাকে সাবধান করে দেয়, দেখো, একদম আওয়াজ যেন না হয়। তিমিরাজা টের পেয়ে গেলে কিন্তু খুব বিপদ। কর্তার গায়েই যে শুধু দারুণ শক্তি তাই নয়, হরেকরকম জাদুতেও একেবারে ওস্তাদ। খেয়াল হল তো চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে তোমার বউকে একটা তিমি করে দিতে পারেন। তবেই তো ব্যস, আর তুমি বউকে কোনোদিন খুঁজে পাবে না। তিমির পালের মধ্যে তাকে আর চিনবে কী করে?

শুনে তো শিকারির বুকের রক্ত হিম। যথাসন্ত্ব আলতো পায়ে চলে। ভয়ে যেন নিশ্বাসও পড়ছে না। দূর থেকে তিমিরাজার বাড়ির বিরাট ফটক দেখা যাচ্ছে। শিকারি ফিসফিস করে কাঠুরেকে বলে, আরে আমি কি তোমাদের কর্তামশাইয়ের অতিথি যে সদর দরজা দিয়ে গটগট করে চুকব। চুপিচুপি খিড়কি দিয়ে চলো রান্নাঘরে। আর সবচেয়ে আগে বালতি নিয়ে এসো কয়েকটা। অনেক জল লাগবে।

কাঠুরে বালতি নিয়ে এলে দুজনে দু-হাতে দুই দুই চার বালতি জল নিয়ে খুব সাবধানে পা টিপে টিপে পিছনের দরজা দিয়ে রাজবাড়িতে ঢেকে। রান্নাঘরের ফোকর দিয়ে দেখে সারি দিয়ে গনগন করে জুলছে পাথরের মন্ত চার চারটে চুলি। সামনে বসে শিকারি বউ। তার চোখ থেকে টপটপ করে গাল বেয়ে নামছে জল। একেইতো সে তিমির খপ্পরে, তার ওপর এমন সব রাক্ষসে চুল্লি। একেবারে নাজেহাল অবস্থা। ছেট্ট কাঠের উনোনে মানুষের মাপে রান্না করা তার অভ্যেস। মাথা থেকে পা পর্যন্ত তার ঘামে নেয়ে গেছে। শিকারি ও কাঠুরে জলের বালতিগুলো দরজার সামনে এনে রাখল। তারপর সেগুলো ঠেলে ঢোকাল রান্নাঘরে। মেঝেতে বালতি ঘসে যাওয়ার আওয়াজে তিমিরাজা তার ঘর থেকে হাঁক ছাড়ে, কে রে ওখানে? কীসের শব্দ?

চমকে পিছন ফিরে তাকাল শিকারিবউ আর অমনি ঝাটাপট শিকারি আর কাঠুরে বালতি ভরা জল উলটে দিল সব উনোনের ওপর। উনোন নিভে চারদিক ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় অন্ধকার। এক লাফে শিকারি ঘরের ভেতরে এসে বউকে হ্যাচকা টানে বাইরে এনে ফেলে। এনেই করল কি,



কোমরে বাঁধা চামড়ার দড়িতে মারল এইসা এক টান। দড়ির ধাক্কা এসে লাগল সমুদ্রের ওপরে
ভেসে থাকা নৌকোর গায়ে। বন্ধু তো সজাগ হয়েই ছিল। তৎক্ষণাৎ সে প্রাণপণে দড়িটা ওপরে
তুলতে লাগল। তোলা কি সহজ কথা! দড়ির আগায় ঝুলে রয়েছে শিকারি আর সে দু-হাতে
জড়িয়ে ধরে আছে তার ফিরে পাওয়া বউকে। দু-দুটো আন্ত মানুষ। ভাগিয়স শিকারির মাথা
ঠাড়া। দুজনে মিলে সাঁতরাবার ভঙ্গিতে ঢেউয়ের সাথে সাথে বন্ধুর হাতের টানে ওপরে উঠতে
লাগল। যখন নৌকো অবধি উঠেছে তখন তিনজনেই হাঁপাচ্ছে। এখন ভালোয় ভালোয় তিমির
তাড়া থেকে রক্ষা পেলে হয়।



এদিকে তিমিরাজা তো টের পেয়েছে কিছু একটা গড়বড় হয়েছে। রান্নাঘরের দিকে যেতে দেখে ধোঁয়া আর ধোঁয়া। কোনোরকমে চোখ-নাক বুজে হাতড়ে হাতড়ে দেখে, তাই তো, কই মানুষের মেয়েটা কোথায়? নেই নাকি? রাজা তো প্রথমে বিস্ময়ে হতভস্ব। এত বড়ো স্পর্ধা মানুষের! স্বয়ং তিমিরাজার প্রাসাদ থেকে শিকার নিয়ে পালাতে সাহস করে সে! সারা সাগর তারই রাজত্ব, যাবেটা কোথায়!

ইঁক ছাড়ল তিমিরাজা। দেখো না দেখো ধেয়ে এল ছোটো বড়ো মাঝারি সাদা কালো পাঁশুটে তিমি প্রজারা। এলে হবে কী। বিরাট বিরাট জুলন্ত চুল্লি জলে নিতে প্রাসাদ ছেয়ে গেছে ধোঁয়ায়। সকলে কোনোরকমে কাশতে কাশতে চলল মানুষের মেয়ের সন্ধানে। একটু যেতে না যেতেই দেখা সাগর পাখিদের সঙ্গে।

একী তাজ্জব ব্যাপার! সাগর পাখিরা দিব্য চোখ খুলে সব দেখছে প্যাটপ্যাট করে। আর দেখতে পেয়েই বোধ হয় তাদের সাহসও গেছে বেড়ে। আগ বাড়িয়ে এসে তিমির দলকে বলল, আমাদের চোখ খুলল কীসে জানো? এই শিকড় খেয়ে। একটা করে খেলে শরীরের সব কষ্ট দূর হয়ে যায়। তোমরা খাবে? আহা বড় কাশি হচ্ছে, চোখ জ্বালা করছে, না?

তাদের কথা শেষ হতে না হতে ছেলে বুড়ো জোয়ান মায় রাজা পর্যন্ত সব তিমি সাগর পাখিদের কাছ থেকে শিকড় নিয়ে কচকচ কচকচ করে চিবোতে শুরু করে। শিকড়ের রস যেই তাদের গলা বেয়ে ফেঁটা ফেঁটা পেটে পৌছোল অমনি তাদের চোখ এল জড়িয়ে। শিকড়টা আসলে ঘুমের ওষুধ কিনা! দেখতে দেখতে তিমির পাল অচেতন হয়ে গেল। আর মহাসমুদ্র তাদের নিঃসাড় শরীরগুলো ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভাসিয়ে নিয়ে চলল। ডাঙা থেকে দূরে বহু দূরে। তারপর থেকে তিমিরা আর তীরে এসে মানুষদের উভ্যক্ত করতে পারে না।



যেমন কর্ম শ্রেমনি ফল

সে অনেকদিন আগের কথা। পৃথিবীতে তখন দৈত্যদানব ভূতপ্রেতের রাজত্ব। সেই সময় এক নদীতে বাস করত ভীষণ একটা পিশাচ। নাম তার জিন কিবারু। জাদুবিদ্যায় একেবারে ওষ্ঠাদ। জাদুর জোরে তার হরেক রকমের গানবাজনা জানা। আর সেই বিদ্যে ফলিয়ে সে গড়ে তুলেছে এক গাইয়ে বাজিয়ের দল। প্রায়ই সে জলের ওপর বসে সাঙ্গোপাঙ্গা নিয়ে গানবাজনা করে। তার সুরের মায়ায় মুগ্ধ হয়ে উঠে আসে জলের সব জীবজন্তু। জিন কিবারুর মায়াবী সুরে বিভোর হয়ে তাদের কাঞ্জান হারিয়ে যায়। তারা তখন ওঠা-বসা করে জিনের হুকুমে।



সেই নদীর ধারে এক বিশাল ধান খেত। তার মালিক ফারান নামে এক যুবক। ফারানের বয়স অল্প হলে কী হবে দায়িত্বজ্ঞান একেবারে বড়োদের মতো। খেতে আপ্রাণ খাটে, গায়ের জেরও তার প্রচঙ্গ। বাড়িতে থাকার মধ্যে শুধু বুড়ি মা, বাবা অনেককালই গত। শোনা যায় মাছ ধরতে গিয়ে নাকি বেঘোরে জলে ডুবে মারা গেছে। আসল ঘটনাটা কিন্তু একেবারে অন্য। ফারানের বাবা সেকালের এক মস্ত ওঝা, দুনিয়ার যত মন্ত্রতন্ত্র ছিল তার নখদর্পণে। জিন কিবারু প্রথম যখন নদীতে আস্তানা বাঁধল তখন গোড়াতেই তার ভয় হল ফারানের বাবাকে। এই হচ্ছে একমাত্র মানুষ, জিন কিবারুকে ঘায়েল করার মন্ত্র যার জানা। এরকম একজন মারাত্মক গুনিন প্রতিবেশী নিয়ে জিন নিশ্চিন্তে বসবাস করে কী করে। ভারী দুশ্চিন্তা তার। ওত পেতে থাকে। সুযোগ পেলেই খতম করতে হবে একমাত্র শত্রুটিকে।

এদিকে ফারানের বাবা নিজের মনে মন্ত্রতন্ত্র নিয়ে থাকে বাড়ির ভেতর। বাইরের জগতের খোঁজ বিশেষ রাখে না। নেহাত গাঁয়ের লোকেরা বিপদেআপদে পড়লে তাদের ডাকে গিয়ে ঝাড়ফুঁক করে আসে। খেতের কাজকম্বে তার বড় আলিস্য। ঘরে অভাব লেগেই আছে। একদিন হয়েছে কি, ভাঁড়ারে খুদকুঁড়েটুকুও নেই। উনোন জুলেনি। বাচ্চা ফারান খিদেতে কাঁদছে। রাগে গজগজ করতে করতে মা বলে, বলি, খালি পেটে আর কত পঞ্চিতি চালাবে? তোমার মন্ত্রটেরের জোর একবার কাজের মতো কাজে দেখাও। ওই ঝাড়ফুঁক-টাড়ফুঁক ছেড়ে ছেলে আর বউয়ের পেটে কিছু দেবার ব্যবস্থা করো। তুমি তো না হয় ওঝা-টোঝা, খিদেতেষ্ঠা বোধ নেই। আমরা তো সাধারণ মনিষ্য।

গিন্নির গজগজানিতে মনে ভারী দুঃখ হয় ফারানের বাবার। আর সত্যি কথা বলতে কি খিদে তারও তো পায়। ওঝা বলে কি মানুষ নয়? ফারানের বাবা বাড়ি থেকে বেরোয়। দেখে তখন পশ্চিম আকাশ লাল, সূর্য ডুবতে চলেছে। মনটা ধক করে ওঠে। ভারী অসময়। সূর্য ওঠা আর সূর্য ডোবার সময় আলোআঁধারিতে তার মন্ত্রের ক্ষমতা থাকে না। গনগনে রোদ চাই। কিন্তু ফেরার উপায় নেই। বউ তাহলে যা তা বলবে। তা ছাড়া ঘরে শিশু সন্তানটা পর্যন্ত উপোস করছে। হাজার হলেও বাবা তো। লজ্জা হয়। কিছু জোটাতেই হবে। অগত্যা অসময়েই চলে ছিপ হাতে। টোপের জন্য চার জোগাড়, মাছ ধরার ডিঙিটা বের করা এইসবে আরও খানিক সময় চলে যায়। নদীতে পৌছে ডিঙি ভাসিয়ে একেবারে মাছের আড়ডায় গিয়ে ছিপ ফেলে।

জিন কিবারু তো তক্কে তক্কে ছিল। সাঁবোর বেলা পরম শত্রুকে একেবারে তার খাস এলাকা নদীর জলে ছিপ হাতে বসা দেখে তার কী আনন্দ! এতদিনে ব্যাটাকে বাগে পাওয়া গেছে। জলের ভেতর থেকে বড়শি ধরে জিন মারল এক টান। ফারানের বাবা তো খুব খুশি, না জানি কী বিরাট মাছ টোপ গিলেছে। প্রাণপণে দু-হাতে মুঠো শক্ত করে ছিপ ধরে মারে টান। অমনি জলের ভেতর থেকে জিন কিবারুও জোর হ্যাঁচকা মারল। ছিপসুন্দু ঝাপাস করে জলের মধ্যে পড়ে গেল ফারানের বাবা। আর যাবে কোথায়। এখানে তার কোনো জারিজুরি খাটে না। কাজেই অত বড়ো ওঝারও আর ডাঙায় ফেরা হল না। পরদিন দেখা গেল তার মরা শরীরটা



ভাসতে ভাসতে পাশের গাঁয়ের ঘাটে গিয়ে ভিড়েছে। এ গাঁ, ও গাঁ সব জায়গায় রটে গেল ফারানের বাবা জলে ডুবে মরেছে।

একথা বিশ্বাস করল না শুধু একজন—ফারানের মা। তার ঘোর সন্দেহ এটা ওই নতুন পিশাচ জিন কিবারুর কোনোরকম কারসাজি। কিন্তু মুখ ফুটে কখনো সে কিছু বলে না। ফারান তখন ক-বছরের শিশু মাত্র। সে কোন ভরসায় ভয়ংকর পিশাচের সঙ্গে পাল্লা দেবে! কাজেই মনের দুঃখ মনেই রয়ে যায়। দিন কাটে মুখ বুজে।

দেখতে দেখতে ফারান বড়ো হয়। সে কিন্তু বাপের মতো ঘরকুনো নয়। মন্ত্রতত্ত্বেরও ধার ধারে না। মনের আনন্দে মাটিতে লাঙল চালায়, বীজ বোনে, মাঠ ভরা ফসল কেটে খামারে তোলে, সুখেস্বচ্ছন্দে বাস মায়েপোয়ের। খালি একটি কাঁটা মায়ের মনে ফুটে আছে—জিন কিবারু। ফারানকে মা পইপই করে বলে, খবরদার নদীর জলের মধ্যে যাসনে কখনো। মাছ খেতে সাধ হয় তো গাঁয়ের পুকুরে ধর গে যা।

বাপের মাছ-ধরা ডিঙি বাইরের দাওয়ায় পড়ে থাকে। কোনোদিন জলে ভাসে না। তবু ফারান ডিঙিটা বিক্রি করতে রাজি নয়। ডিঙিটাই তো বাবার শেষ চিহ্ন।

এদিকে আর একজনেরও স্বত্ত্ব নেই। সে হল জিন কিবারু। যে পাপকাজ করে, তার মনে শান্তি কী করে থাকবে। সদাই তার ভয়, ফারান যদি মন্ত্রতত্ত্ব শিখে ফেলে, যদি জিন কিবারুর ওপর শোধ তুলতে চায়। একদিন না একদিন চাইবেই। নিশ্চয় চাইবে। তাই জিন আগে থেকেই ফন্দি আঁটতে শুরু করে। ফারান ছোঁড়াটাকে গাঁ থেকে ভাগিয়ে দিলে তবে নিশ্চিন্তি। এমন করে জ্বালাবে যে তিতিবিরস্ত হয়ে ফারান পালিয়ে বাঁচবে।

তখন হেমন্তকাল। ফারানের হাতের বোনা ধান যেন খেতে থরে থরে সোনা ফলে আছে। দু-চার দিনের মধ্যেই কেটে ঘরে তোলা হবে। ছেলে আর মায়ের সারা বছরের ভরণপোষণ। যেটুকু দরকার খাওয়ার জন্য রাখবে। বাড়তি ফসলের বদলে অন্যান্য জিনিস কিনবে। যেমন প্রতি বছর হয়ে আসছে। একদিন রাতে জিন কিবারু দলবল নিয়ে জলের ধারে বসল। রকমারি বাজনায় বাজাতে শুরু করল এক অপরূপ সুর। আর সেই মায়াবী সুরের টানে জলের ভেতর থেকে উঠে এল ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ। সুরের নেশায় বিভোর জিন কিবারুর পায়ে পড়ে তারা বলল, প্রভু, আমরা আপনার দাস। কী হুকুম? যা বলবেন করব।

জিন কিবারু তৎক্ষণাতে বলল, নদীর ধারে ওই যে দেখছ বড়ো খেতটা। ওখানে ধান হয়েছে। একেবারে পাকা। যাও তোমরা খেত উজাড় করে সব ধান খেয়ে ফেলো গে।

যথা আজ্ঞা।

মাছেরা লাফ দিয়ে দিয়ে ডাঙায় উঠতে লাগল। অবিশ্বাস ব্যাপার! ডাঙায় উঠে জিনের মায়ার গুণে তারা দিব্য পা ছাড়াই ঝাঁকে ঝাঁকে এগিয়ে যেতে লাগল। মাছ না যেন পঙ্গপাল। পাখনা যেন ডানা। ঝাঁপিয়ে পড়ল সব ফারানের পাকা ধানে। রাত কাবার হতে না হতে সব ধান নিঃশেষ।

সকালে ফারান এসেছে ধান কাটতে। দেখে সমস্ত খেত লঞ্চবঙ্গ, যেন তাঙ্গৰ হয়ে গেছে। একটিও ধান নেই। তার এত কষ্টে ফলানো সারা বছরের সংস্থান এক রাতে উধাও, যেন ভোজবাজি। রাগে দুঃখে ফারানের চোখ ফেটে জল আসে। বুড়ি মা অপেক্ষা করে বসে আছে। আজ তার ধান নিয়ে ঘরে তোলার কথা। কিন্তু ধান কই। সারাদিন তন্মতন্ম করে খোঁজে আশপাশ। যদি কোনো হদিস মেলে এ রহস্যের। কোনো কিনারা পায় না সে।

মা-র এদিকে তড়িঘড়ি রান্নাবান্না সারা। আজ ফসল আসবে ঘরে। তারপর কত কাজ কাল থেকে। ঝাড়াই মাড়াই বাছাই। ও মা, ছেলে দেখি ঘরে ফেরে খালি হাতে। ব্যস্ত হয়ে মা জিজ্ঞেস করে, কী রে আজ না ধান কাটার কথা ছিল? ফসল আনলি না?

ক্লান্ত ফারান মাথা নেড়ে বলে, না, ধান নেই।

মা তো হতভস্ব।

ধান নেই মানে? খেত ভরতি অমন সোনার ফসল। এই তো কাল বিকেলেও দেখলাম মাঠ আলো হয়ে আছে। রাতারাতি ধান নেই!

ফারানের মুখে ধান উধাও হওয়ার বৃত্তান্ত শুনে মা আর থাকতে পারে না। এতদিনের লুকনো রাগ আর ক্ষেত্রে ফেটে পড়ে, এ আর কেউ নয়, সেই শয়তান জিন কিবারুর কীর্তি। রাতের অন্ধকারে সব ধান সাফ। এ কখনো মানুষের ক্ষমতায় হয়? নির্ধাত জাদু। বাপকে শেষ করে আশ মেটেনি, এখন এই এক ফোঁটা ছেলে, তার ওপর নজর পড়েছে। না খাইয়ে মারার ফন্দি।

ফারান শুনতে শুনতে শুন্তি শুন্তি।

—তুমি কীসব বলছ মা? জিন কিবারু কে? বাবার কি তবে জলে ডুবে মৃত্যু হয়নি? বলো বলো?

অগত্যা মা তখন সব কথা খুলে বলে। তার এতদিনের সন্দেহ ভয়, কিছুই বাদ দেয় না। সমস্ত শুনে ফারান চুপ করে বসে থাকে। যেন পাথর। সন্ধে হয়। মা খেতে ডাকলে উঠে কোনোরকমে দুটো নাকেমুখে গুঁজে এসে শুয়ে পড়ে।

রাত নিশ্চিত। কাজকর্ম সেরে ঝান্ট মা ঘুমে অঘোর। ফারানের দু-চোখের পাতা এক হয় না। তার চোখে ঘূম নেই। পা টিপে টিপে আস্তে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসে। চাঁদনি রাত, রূপোলি আলোয় চারিদিক যেন স্বপ্নলোক। ফারানের কিন্তু এসব দিকে তাকাবারও মন নেই। রান্নাঘর থেকে তেল নিয়ে এসে বাবার এতদিন পড়ে থাকা ডিঙিটার তলায় বেশ করে ঘসতে থাকে। তারপর তাকে টেনে হিঁচড়ে বের করে নিয়ে চলে নদীর দিকে। আগে কোনোদিন সে নদীতে ডিঙি বায়নি, মায়ের বারণ ছিল। কিন্তু আজ তার কোনো পরোয়া নেই। জলে ভাসায় ডিঙি, বেয়ে চলে জিন কিবারুর সন্ধানে।

সমানে নৌকো বেয়ে বেয়ে শেষ রাতে এসে পৌছায় নদীর মোহনায়। চারিদিকে জল, শুধু জল। যেন অসীম সমৃদ্ধি। ফারান তো বেশ ঘাবড়িয়ে গেল। জ্যোৎস্নার আলোয় দেখে ছেট একটা দ্বীপ, আর তার মধ্যখানে এক টিলা। তারই ওপর বসে বীণা বাজাচ্ছে এক পিশাচ। চারিদিকে তার চেলাচামুণ্ডা। কেউ বাজাচ্ছে ঢাক, কেউ দোল, কেউ বা বাঁশি, একজনের হাতে করতাল। বাকিরা সমস্ত দ্বীপ জুড়ে লাগিয়েছে নাচ, তা তা ধেই ধেই, তা তা ধেই ধেই।

মায়ের কাছ থেকে ফারানের জানা হয়ে গেছে এই বীণাই হল জিন কিবারুর সব কেরামতির মূল। যার দখলে থাকবে এ বীণা, তারই ক্ষমতা অসীম। ফারান হাঁকল, ওহে জিন কিবারু তোমার বীণাটা যে আমার চাই।

ফারানের মতলব বুঝে জিন কিবারু পালটা হাঁক ছাড়ে, ওহে নাড়ুগোপাল, অমনি অমনি পাবে নাকি ভাবছ? মুরোদ থাকে তো যুদ্ধ করে কেড়ে নাও।

ফারান বীর দর্পে এগিয়ে আসে, বেশ তো, এসো, লড়াই হোক।

জিন কিবারু মুচকি হেসে বলে, দাঁড়াও অত তাড়া কীসের? আগে যুদ্ধের শর্ত ঠিক হোক। আমি যদি হারি তো তুমি পাবে আমার বীণা। আর তুমি যদি হারো, আমি নেব তোমার ডিঙিটা। কেমন, রাজি?

বীণার লোভে ফারান আগে-পিছে না ভেবেই ঘাড় হেলিয়ে বলে, রাজি।

শুরু হল দুজনের মধ্যে হাতাহাতি লড়াই। জিন কিবারু পাতলা ঢ্যাঙ্গা, ফারান বেঁটে খাটো গাটাগোটা। জিনকে ফারান প্রায় কাবু করে এনেছে এমন সময় জিন বিড়বিড় করে মন্ত্র আওড়াল।

—শীর্ণ তালপত্র করে অবজ্ঞা স্থূল জলহস্তীরে। অমনি দড়াম করে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল ফারান। জিন তো মহানন্দে তাক ধিনাধিন তাক ধিনাধিন নাচতে নাচতে ডিঙিখানা নিয়ে গেল তার

দ্বীপে। আর জ্ঞান ফিরে উঠে ভোর থেকে সারাদিন ধরে নদীর পাড় ধরে হেঁটে বাঢ়ি ফেরে ফারান। লজ্জায় অপমানে তার ওপর ক্লান্তিতে কথা বলার ক্ষমতা নেই।

এদিকে সকাল থেকে ফারানকে বাঢ়িতে না পেয়ে মায়ের তো মহা উদ্বেগ। সমানে ঘরবার করছে। বেলা শেষে ছেলের সাড়া পেয়ে বাইরে এসে তো চক্ষু স্থির। এ কী আবস্থা! কাদামাখা জামাকাপড়। ছিঁড়ে ফর্দাফাই, গায়ে মুখে অজ্ঞ নথের আঁচড়। তাড়াতাড়ি তাকে গা হাত পা মুছিয়ে কিছু খাইয়ে শোনে জিন কিবারুর সঙ্গে যুদ্ধের কথা। ছেলের গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে মা বলে, দূর বোকা ওভাবে কি লড়াই জেতা যায়। আগে থেকে তৈরি হতে হয়। ভূতপ্রেতের সঙ্গে লড়াই সোজা কথা নয়। জাদুর অস্ত্র জাদু। তোর বাবা ছিল অগাধ পণ্ডিত গুনিন। আমাকেও কটা মন্ত্র শিখিয়ে ছিল। বলা তো যায় না যদি তেমন বিপদে পড়ি তো লাগবে। আয় তোকে সেগুলো শেখাই।

একমনে ফারান জাদুবিদ্যা শেখে। এখন তার খেতের কাজে মন নেই, মন নেই নাওয়া খাওয়ায় খেলাধূলায় গল্লগাছায়। শুধু মন্ত্র শেখা। একদিন তার শেখা শেষ হয়। ভোর বেলা উঠে ম্বান সেরে মাকে প্রণাম করে বেরিয়ে পড়ে। প্রথমে যায় গাঁয়ে। সেখানে একজন জেলের কাছ থেকে বড়োসড়ো একটা নৌকো ধার নেয়। সেটাকে টেনে নিয়ে নদীতে হাজির। এবারে তার রাস্তা জানা। অনায়াসে নৌকো বেয়ে দুপুরের অনেক আগে পৌঁছায় জিন কিবারুর দ্বীপে।

দিনের বেলা ভূতপ্রেতদের বিশ্বামের সময়। জিন কিবারু ও তার দলবল ঝোপেঝাড়ে জঙ্গলে ঘুমোছে। দু-চারজন চেলা দ্বীপ পাহারা দিচ্ছিল। দূর থেকে ফারানের নৌকো দেখে তারা জিনকে ডেকে তোলে। চোখ মুছতে মুছতে জিন তাড়াতাড়ি জেলের ধারে আসে। জিন মনে মনে খুব সাবধান হয়ে গেছে। হেরে গিয়ে ফারান যখন আবার এসেছে তখন নিশ্চয়ই কোনো নতুন অস্ত্র জোগাড় করেছে। এদিকে বেশ রোদ। খুব সাবধানে গা বাঁচিয়ে সে লড়াই শুরু করে। ফারানের দেহে প্রবল শক্তি, তার চেয়ে তের বেশি। যেই তাকে ফারান হারাতে যাচ্ছে অমনি জিন করল কি, হু-স্ করে জলে ডুব মারল। জলের তলায় তার নিজস্ব এলাকা। ফারানের নাগালের বাইরে।

ফারান কিন্তু ঠিক করে এসেছে আজ এসপার-ওসপার করে ছাড়বে। নদীর মধ্যে ডিঙিতে সে বসে থাকে। জানে জিনকে ওপরে উঠতেই হবে। জলের তলায় তো বীণা বাজাতে পারবে না। ধৈর্য দরকার, ধৈর্য। ঘণ্টা তিনেক পর যেই জিন জল হেকে মাথা তুলেছে অমনি ফারান লাফিয়ে পড়ে তার ঘাড়ে। আবার চলে প্রচণ্ড যুদ্ধ। ঠিক হারবার মুখে জিন জলে দিল ডুব। আবার অপেক্ষা করে ফারান। বেলা পড়স্ত। কিন্তু গ্রীষ্মকাল এখনও গনগনে রোদ। অবশেষে জিনকে উঠতে হয়।

এবারে শুরু ভয়ংকর লড়াই। দুজনেই মরণপণ করে যুবাছে। জিন কিবারু বুঝে গেছে আজকে ফারানকে হারাতে না পারলে তার নিষ্ঠার নেই। ফারান তখন জিনকে প্রায় কাবু করে



ফেলেছে। জিন তাই ছাড়ল তার সেই মোক্ষম অস্ত্র, শীর্ণ তালপত্র করে অবজ্ঞা স্থূল জলহস্তীরে।
সঙ্গে সঙ্গে ফারান পাল্টা অস্ত্র হানে, দগ্ধ তালপত্র আজি জুলন্ত সূর্যের করে।

সঙ্গে সঙ্গে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল জিন কিবারু। সূর্যের প্রচণ্ড তাপ শুষে নিল তার
সঁ্যাতসেতে ছায়াছায়া পিশাচপ্রাণটা। কোথায় শুন্যে মিলিয়ে গেল সে। আর তার গাইয়ে বাজিয়ে
সঙ্গী ভূত প্রেতরা বাজনাটাজনা ফেলে জলে দিল ঝাঁপ। আর উঠল না।

ମାତ୍ର ଏକ ଛଡ଼ା ଭୁଟ୍ଟା

ପୃଥିବୀର ଶୁରୁତେ ମାକଡୁସା ଛିଲ ସବଚେଯେ ଚାଲାକ ପ୍ରାଣୀ । ସକଳେ ତାକେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭକ୍ତି କରତ । ତାତେ ତାର ଆଶ ମିଟିତ ନା । ଭାରୀ ସାଧ ସ୍ଵର୍ଗେ ତାର ବୁନ୍ଧିର କଦର ହୋକ । କିନ୍ତୁ ସ୍ଵର୍ଗେ ଖାତିର ପେତେ ହଲେ ଭଗବାନକେ ଖୁଶି କରା ଚାଇ । ଦେବଦେବୀରା ସାମାନ୍ୟ ମାକଡୁସାକେ ଗ୍ରାହ୍ୟ କରବେନ କେନ ! ଅନେକ ଭେବେଚିନ୍ତେ ମାକଡୁସା ଏକଟା ଫନ୍ଦି ଆଁଟିଲ । ତାରପର ଏକଦିନ ସ୍ଵର୍ଗେ ଭଗବାନେର ସାମନେ ହାଜିର । ହାତ ଜୋଡ଼ କରେ ଭକ୍ତିଭରେ ବଲଲ, ପ୍ରଭୁ, ଆମାର ବଡ୍ଗୋ ଇଚ୍ଛା ଆପନାକେ ଏକଟୁ ସେବା କରେ ଧନ୍ୟ ହେଇ । ଦୟା କରେ କୋନୋ ଶସ୍ୟେର ଏକଟି ମାତ୍ର ଶିଷ୍ୟ ସଦି ଆମାକେ ଦେନ । ତାର ବଦଳେ ପୃଥିବୀ ଥେକେ ଏକଶୋଜନ ତାଗଡ଼ା ଜୋଯାନ ନିଯେ ଆସବ । ତାରା ଆପନାର କାଜକର୍ମ କରବେ ।

ଭଗବାନ ତୋ ମାକଡୁସାର କଥା ଶୁନେ ହେସେଇ ଖୁନ ।

—କୀ ଯେ ବଲିସ ! ଏମନ କୋନ ଶସ୍ୟେର ଶିଷ୍ୟ ଆଛେ ଯାର ବଦଳେ ଏକଶୋଟା ମାନୁଷ ପାଓଯା ଯାଯ । ତୁଇ କି ଆମାର ସଙ୍ଗେ ମଶକରା କରଛିସ ନା କି ?

ମାକଡୁସା ଏକ ହାତ ଜିଭ କେଟେ ବଲେ, ଆପନାର ସଙ୍ଗେ ମଶକରା ! ତା କି କଖନୋ ହୟ । ଖୁବ ଏକଟା ଦାମି ଶସ୍ୟ ଆମି ଚାଇ ନା । ଧାନ ବା ଗମ ଦରକାର ନେଇ । ସମାନ୍ୟ ଏକଛଡ଼ା ଭୁଟ୍ଟା ହଲେଇ ଚଲବେ ।

ଭଗବାନ ଭାବଲେନ ମାତ୍ର ଏକଛଡ଼ା ଭୁଟ୍ଟା, ଦିଯେଇ ଦିଇ । ଲୋକସାନ ତୋ ବିଶେଷ ନେଇ । ଦେଖାଇ ଯାକ ନା ବ୍ୟାଟା କୀ କରେ । ତିନି ମାକଡୁସାକେ ଏକଛଡ଼ା ଭୁଟ୍ଟା ଦିଲେନ । ମାକଡୁସା ତାଙ୍କେ ପ୍ରଣାମ କରେ ସ୍ଵର୍ଗ ଥେକେ ପୃଥିବୀର ପଥେ ଇଁଟା ଦିଲ । ହାତେ ଧରା ଭୁଟ୍ଟାର ଛଡ଼ାଟି ।



সন্ধে হব হব। মাকড়সা এসে পৌছাল স্বর্গ ও মর্তের মধ্যখানে এক গাঁয়ে। প্রথমেই খুঁজে বের করে মোড়লকে। তাকে বলে, রান্তিরটা থাকার মতো একটু জায়গা হবে?

অতিথিকে আশ্রয় দেওয়া অবশ্যকর্তব্য। তাই মোড়ল নিজের বাড়িতেই একটা ঘরে মাকড়সাকে থাকতে দিল। শোবার আগে মাকড়সা তাকে ডেকে বলল, দেখুন মোড়লদাদা, একটা কথা আছে। আমার হাতে এই যে ভুট্টার ছড়াটা দেখছেন এটা যে-সে ছড়া, যে-সে ভুট্টা নয়। স্বয়ং ভগবানের জিনিস। এটাকে এমন এক জায়গায় লুকিয়ে রাখতে হবে যাতে কেউ ভুলেও হাত-টাত না দিতে পারে। ভগবানের জিনিস শুনেই তো মোড়ল একেবারে তটস্থ। এদিক-ওদিক চায় আর মাথা চুলকায়। শেষে মাকড়সাকে নিয়ে যায় ছাদে। এক কোণে কার্ণিশের পাশে একটা গর্ত দেখায়। ভুট্টার ছড়াটি সেই গর্তের মধ্যে রেখে দুজনে নেমে আসে। দুজন শুয়ে পড়ে।

রাত গভীর। সবাই ঘুমে অচেতন। আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে ওঠে মাকড়সা। এদিক-ওদিক চেয়ে পা টিপে টিপে চলে যায় ছাদে। সেই কোণের গর্ত থেকে ভুট্টার ছড়াটা নামিয়ে আনে। তারপর ধীরে ধীরে দরজা খুলে আঙ্গিনায় বেরোয়। মুরগিদের খাঁচাঘরে ভুট্টার দানাগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়িয়ে দেয়। তারপর তেমনি নিঃশব্দে ফিরে এসে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ে।

সকালে সবাই ঘুম থেকে ওঠার পর। মাকড়সা মোড়লকে বলে, মোড়লদাদা, এবারে তো আমাকে বেরিয়ে পড়তে হয়। যাই ভুট্টার ছড়াটা নিয়ে আসি। গটগট করে ছাদের সেদিকে যায়। তারপরই এক চিংকার, আরে আমার ভুট্টার ছড়াটা কোথায় গেল? হায়, হায়! কী সর্বনাশ, খালি হাতে আমি ভগবানের কাছে মুখ দেখাব কী করে?

হাউ হাউ করে সে কী কান্না মাকড়সার। দেখতে দেখতে চারিদিকে হইচই পড়ে গেল। পাড়াপড়শি সব জড়ো হল। কী হয়েছে কী হয়েছে? না, স্বয়ং ভগবানের ভুট্টার ছড়া হারিয়ে গেছে। সকলের মুখ ভয়ে চুন। একটা কিছু বিহিত করতে হয়। সবাই মিলে মোড়লকে অনুরোধ করে এমন কোনো ব্যবস্থা করার জন্য, যাতে ভগবান তাদের প্রতি রাগ না করেন। মোড়ল দেখে ভারী বেগতিক। তাড়াতাড়ি নিজের গোলা থেকে মন্ত এক ধামা ভুট্টা এনে মাকড়সার সামনে রাখে। মাকড়সা যেন ভগবানকে এটা দিয়ে তুষ্ট করার চেষ্টা করে। চোখের জল মুছতে মুছতে যেন কত অনিছায় মাকড়সা ঝুঁড়িটা তুলে নেয়।

— তোমাদের আর আমার সাত পুরুষের ভাগিয় যদি ভগবান এই ভুট্টা নিতে রাজি হন। দেখি যদি বুঝিয়েসুবিয়ে নেওয়াতে পারি। উপায় তো আর নেই। আবার যাত্রা শুরু করে মাকড়সা। মাথায় ভুট্টার ঝুঁড়ি। পথে যেতে যেতে দেখে এ তো বড়ো মুশকিল। তার পক্ষে বেশ ভারী। কিছুদূর যেতে না যেতে মাকড়সা ক্লান্ত। ঝুঁড়িটাকে নামিয়ে বসে পড়ে পথের ধারে। নাঃ একটু না জিরোলে আর চলছে না। খানিক বাদেই মাকড়সা দেখে উলটো দিক থেকে একটা লোক আসছে। বগলে একটা মোরগছানা। মাকড়সা তাকে ডেকে বলে, ও ভাই একটু শুনবেন?

লোকটি থমকে দাঁড়ায়।

—কী?

—আমার একটি মোরগছানার বড় দরকার ছিল। আপনি যদি ভাই দয়া করে এই এক ধামা ভুট্টা নিয়ে তার বদলে আমাকে মোরগটা দেন তো বড়ো উপকার হয়।

লোকটি ভাবল, বাঃ এ তো বেশ লাভের লেনদেন। পুঁচকে এই মোরগছানার বদলে এত বড়ো এক ঝুড়ি ভুট্টা। সে আর বিশেষ বাক্যব্যয় না করে তৎক্ষণাত্মে মোরগটাকে মাকড়সার হাতে তুলে দিয়ে ভুট্টার ধামা মাথায় চাপিয়ে চটপট সেখান থেকে চলে গেল।

মোরগছানাটা নিয়ে ধীরেসুস্থে মাকড়সা চলতে শুরু করে। বেলা পড়ে আসে, সন্ধে হয়। রাস্তার দু-দিক ফাঁকা। খেত বনজঙ্গল। বসতি নেই। বেশ রাতে মাকড়সা পৌছায় এক গাঁয়ে। সেখানকার মোড়লকে ধরে বলে, মোড়লমশাই, আমি বহুদূর থেকে আসছি। বড়ো ক্লান্ত, রাতটা কাটাবার মতো একটা জায়গা দেবেন?

এই রাতের বেলা একটা অচেনা লোককে মোড়ল কার বাড়িতে তুলবে। অগত্যা নিজের বাড়িতেই থাকতে দেন। তার জন্য একটা বিছানাও পাতে। শুয়ে পড়বার আগে মাকড়সা বলে, কিন্তু আমার এই মোরগছানাটাকে রাখি কোথায়? এটা যে-সে মোরগ নয়। স্বয়ং ভগবানের সম্পত্তি। হারিয়ে-টারিয়ে গেলে খুব বিপদে পড়ে যাব।

ভগবানের জিনিস তার বাড়িতে! মোড়ল তো ভারী ব্যস্ত। কোথায় রাখা যায় ভগবানের সম্পত্তিকে। তার আঙিনাতে মস্ত মুরগির খাঁচা। সেখানে এক পাল মোরগ-মুরগি। মাকড়সা বলে, না না। ওরা সব সাধারণ মুরগি। এ তো তা নয়। স্বয়ং ভগবানের। ওদের সঙ্গে রাখা যাবে না। মোড়ল তখন তাকে নিয়ে গেল আঙিনার কোণে। সেখানে নতুন আর একটা খাঁচা সদ্য বানানো হয়েছে। সেটা খালি। মোরগটাকে তার ভেতর পুরে খুব ঘেঁষে ঝাপ ফেলে খাঁচা এঁটে দিয়ে যে যার বিছানায় শুয়ে পড়ে।

রাত নিখুম। সবাই ঘুমে কাদা। চুপি চুপি বিছানা থেকে ওঠে মাকড়সা। আঙিনায় খাঁচার ঝাপ তুলে মোরগটা বের করে আনে। টুকরো টুকরো করে মোরগটাকে ছিঁড়ে বাড়ির সীমানার বাইরে ঝোপেঝাড়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তার আগে মোড়লের দরজার সামনে ছিটোল খানিকটা রক্ত। চোকাঠের ধারে ছড়িয়ে দিল মোরগটার কিছু পালক। তারপর হাত-পা ধূয়ে মুছে শুয়ে পড়ল বিছানায়।

ভোরে উঠে সবাই খাঁচার কাছে গিয়ে দেখে মোরগ নেই। কী কান্না মাকড়সার, হায় হায়, এ আমার কী সর্বনাশ হল! কোন হতভাগার নজর পড়ল স্বয়ং ভগবানের জিনিসে? এখন আমি খালি হাতে ফিরি কী করে?

সকলে ঘরদুর্যোর আনাচকানাচ খুঁজতে লাগল। মোরগটা কোনোভাবে বেরিয়ে যায়নি তো। হঠাৎ মোড়লের দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে মাকড়সা চিৎকার করে ওঠে—আরে, এ যে দেখি রক্ত!

সবাই দৌড়ে যায়। দেখে রক্ত, আর তার চারিধারে ছড়ানো মুরগির পালক। মোরগছানার

কী হয়েছে বুঝতে কারো বাকি থাকে না। প্রশ্ন হল, দোষটা কার। সবাই বলল, নিশ্চয় মোড়লের। আর কেই বা জানত খাচাতে ভগবানের মোরগ আছে? সাধারণ চোর হলে বড়ো খাচার এতগুলো মুরগি থেকে নিত। বেচারা মোড়লের কাকুতিমিনতি কেউ কানেই তুলল না। মোড়ল হয়েছে বলে কি সাপের পাঁচ পা দেখেছে! এত লোভ, স্বয়ং ভগবানের জিনিসে হাত! আর তার জন্য ফল ভোগ করবে সকলে। ভগবান তো নির্ঘাত গাঁসুন্ধু লোকের ওপরেই চটে যাবেন।

ওদিকে মাকড়সার তর্জন গর্জন। তোদের মতো নচ্ছার পৃথিবীতে নেই। বলি এত লোভ! ঘরে ঘরে তো মুরগি আছে তবু ভগবানের ওই অতুকু মোরগছানাটা দেখে জিভ দিয়ে জল পড়ে। এই আমি চললাম ভগবানের কাছে। সব বলব গিয়ে। তারপর তিনি যা ভালো বোঝেন করবেন। ভয়ে তো সব লোকেদের বুকের রক্ত হিম। মোড়ল সমেত তারা সবাই মাকড়সার হাতে-পায়ে ধরতে লাগল।

—লক্ষ্মী দাদা রাগ কোরো না। আমরা মুখ্যসুখ্য মানুষ। না বুঝে কে কী করে ফেলেছে। তুমি ছাড়া ভগবানের কাছে আমাদের হয়ে বলবে এমন আর কে আছে? আমরা সকলে মিলে ওই মোরগটার বদলে দশটা নধর ভেড়া দিচ্ছি। দোহাই তোমার, ওগুলো ভগবানকে দিয়ে ওঁকে একটু শান্ত করো। ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করি, দেখো যেন রাগ করে না থাকেন!

মাকড়সা তো প্রথমে মোটেই শুনবে না। তার সেই মোরগছানাটাই চাই। অনেক সাধ্যসাধনার পর নেহাত নিমরাজি হয়ে ভেড়াগুলো নেয়। কিন্তু তারপর সে সেখানে আর বেশিক্ষণ দাঁড়াল না, পথে নেমে দুত হাঁটতে থাকল।

দশ-দশটি সুন্দর হৃষ্টপুষ্ট ভেড়া নিয়ে চলেছে মাকড়সা। খানিক দূর গিয়ে দেখে রাস্তার ধারে একটা মাঠ। বেশ ঘন সবুজ ঘাসে ভরা। ভেড়াগুলোকে ছেড়ে দেয়। যাক একটু চরে খাক। নিজেও বসে একটা গাছতলায়। একটু পরে দেখে একদল লোক আসছে। কাঁধে একটা মড়া। মাকড়সা জিজ্ঞাসা করে, ওহে মড়াটাকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছ?

দলের মাতবর উত্তর দেয়, আর বল কেন। এ ছেঁড়াটা বহুদূর থেকে আমাদের গাঁয়ে এসেছিল। যাচ্ছিল কোন শহরের দিকে কাজের খোঁজে। কী একটা অসুখে পড়ে হঠাৎ মারা গেল। আমাদের নিয়ম নিজের জাতের লোক ছাড়া কেউ মৃতদেহ সংকার করতে পারবে না। তাই আমাদের এখন ওকে বয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে ওর নিজের গাঁয়ে। নিজের লোকের হাতে তুলে দিয়ে তবে আমাদের নিষ্ক্রিতি। কী যে ঝামেলায় পড়েছি।

মাকড়সা গাঁয়ের নাম জিজ্ঞাসা করে। নাম শুনে বলে, আরে আমি তো ওই গাঁ হয়েই যাব। তাহলে তোমরা ভাই এক কাজ করো না কেন, মড়াটা আমাকে দাও। আমি তো যাচ্ছিলামই, ওকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি। তবে একটা সমস্যা আছে। ওই যে ভেড়াগুলো চরছে দেখছ, ওগুলো আমার। একসঙ্গে ভেড়ার পাল আর মড়া সামলাব কী করে বলো তো? সেই তো মুশকিল! এক কাজ করো। তোমরা আমার ভেড়ার পাল নিয়ে যাও, আর আমি তোমাদের মড়াটা নিই।

লোকেরা দেখল এ তো রামগাধা। দশ-দশটা জলজ্যান্ত অমন নধর ভেড়ার বদলে কিনা চায় একটা মরা মানুষ। পাছে এমন একটা দাঁও ফসকে যায়, তাই তারা তড়িঘড়ি মড়াটাকে তার সাদা ঢাকা সহ নামিয়ে রেখে, হঁ্যা হঁ্যা সে তো খুব ভালো কথা, বলতে বলতে ভেড়ার পাল নিয়ে চলে যায়।

প্রথমে মড়াটাকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত ভালো করে ঢেকেতুকে ফেলে মাকড়সা। তারপর কোনোরকমে তাকে পাঁজাকোলা করে এগোয়। একটু যায়, একটু বসে, কোনোক্রমে একটা গাঁয়ে পৌঁছায়। মোড়লকে ডাকে। সে এলে পর তাকে গভীর মুখে বলে, দেখো বাপু আমি একটা খুব জরুরি কাজে এসেছি। এই যে আমার সঙ্গে কাপড়ে ঢাকা মানুষটা, এ হচ্ছে ভগবানের ছোটো ছেলে, সবচেয়ে আদরের। কিন্তু এর একটা অঙ্গুত রোগ আছে। দেখ না দেখ ঘূম। আর একবার ঘূম পেলে হল, ব্যস একেবারে মরার মতো ঘুমোবে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তাই আমার কাজ হল সর্বদা একে চোখেচোখে রাখা। বলা তো যায় না কখন ঘুমিয়ে পড়ে। এই দেখো না রাস্তায় আসতে আসতে হঠাৎ ঘূম এসে গেল। এখন আমি এই জোয়ান ছেলেটাকে বয়ে নিয়ে পথ চলি কী করে? শিগগিরি এর থাকার একটা ঘর দাও। মোড়ল তো মহাব্যস্ত। লোকজন ডেকে ধরাধরি করে ভগবানের ছেলেকে তার নিজের বাড়িতেই নিয়ে গেল। সবসেরা ঘরটি সাফসুতরো করে তাতে পরিপাটি বিছানা পাতে। সকলে মিলে যত্নে আদরে ভগবানের ছেলেকে শুইয়ে দেয়।

দেখতে না দেখতে কথাটা চাউর হয়ে গেল। এ গাঁয়ের কী সৌভাগ্য। স্বয়ং ভগবানের ছেলে এখানে এসে রয়েছে। চারিদিকে আনন্দের ধূম। গ্রামবাসীরা সবাই মিলে বিরাট ভোজের আয়োজন করে। বলাবাহুল্য আমাদের মাকড়সা সেখানে প্রধান অতিথি। খুব খাওয়াদাওয়া হইচই চলল। পেটপুরে খেল মাকড়সা।

পরদিন সকালে মোড়লের ছেলেপিলেদের ডাকে মাকড়সা। ওহে বাছারা একটা কাজ করো তো। ভগবানের ছেলেকে ধূম থেকে এবারে তোল। ছেলেটা বড় ঘুমায়। তোমরা সবাই মিলে ওকে খুব করে ঝাঁকাও। তাতেও যদি না ওঠে তাহলে দু-চার ঘা চড়চাপড় লাগিয়ো, কোনো দোষ হবে না। ওকে জাগানো রীতিমতো যুদ্ধ। সবাই গেল ভগবানের ছেলেকে জাগাতে। কিন্তু ছেলে একেবারে নড়েচড়ে না। কোনো সাড়া নেই।

মাকড়সা বলল, তাহলে এক কাজ করো। এক গাছ লাঠি নিয়ে দমাদম কয়েক ঘা লাগাও। না জেগে ব্যাটা যাবে কোথায়!

ছেলেরা তো লাঠি নিয়ে জাগাতে গেল। খানিক বাদে ফিরে এসে বলল, কত পেটালাম তবু ঘূম ভাঙছে না। আপনি এবারে নিজে এসে দেখুন।

তখন মাকড়সা ঘরে গিয়ে ঢাকা চাদরটাকে একটানে সরিয়ে দিয়ে বিকট চিৎকার করে উঠল, আরে এযে একেবারে মরে গেছে। হায় হায়, তোরা কী সর্বনাশ করলি! ভগবানের ছেলেকে পিটিয়ে মেরে ফেললি। এখন আমি কোন মুখে ভগবানের কাছে ফিরে যাব! তোদের মতো

উজুকের হাতে তাঁর এত আদরের ছেলের প্রাণ গেল। ওরে তোদের পরকাল কী হবে? আমিই
তো সব কিছুর জন্য দায়ী, আমাকে উনি কি আর আন্ত রাখবেন!

হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল মাকড়সা। মোড়লের ছেলেরা ভয়ে সিঁটিয়ে মায়ের আঁচলের
তলায় লুকোয়।

দাবানলের মতো খবর ছড়িয়ে পড়ল গায়ে, মোড়লের বাড়িতে ভগবানের ছেলেকে মেরে
ফেলা হয়েছে। সকলের কাজকর্ম রান্নাবান্না খাওয়াদাওয়া সব বন্ধ হয়ে গেল। ঘরে ঘরে হায় হায়
রবে বিলাপ ধ্বনি শোনা যেতে লাগল। গায়ের সব বয়ঙ্করা মাকড়সাকে মিনতি করে বলল,
আপনিই বলুন আমরা কী করব। এ পাপের কী প্রায়শিত্ত?

মাকড়সা একটা ঘরে দরজা বন্ধ করে চিন্তাভাবনা করছে। বাইরে গায়ের লোক হাপিত্যেশ
করে বসে। রাত তিন প্রহর। সবাই খিদে আর দুশ্চিন্তায় অস্থির! মাকড়সা আন্তে আন্তে ঘর
থেকে বেরোল। ধীর গন্তীর গলায় বলল, দেখুন আমি চিন্তা করে দেখলাম আমাকে প্রভুর কাছে
ফিরে গিয়ে এ ভয়ংকর দুঃসংবাদ দিতেই হবে। এটা আমার শেষ কর্তব্য। তারপর তিনি যা শাস্তি
দেন আমি মাথা পেতে নেব।

গায়ের লোকদের মধ্যে ফিসফিস গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল। ভগবানের কি কখনো অজানা
থাকবে আসল অপরাধী কারা। তখন গায়ের লোকদের ওপর বর্তাবে সব দোষ। একটু আমতা-
আমতা করে একজন বলে, আপনি তো কোনো দোষ করেননি। করেছে তো—তার কথা শেষ
হওয়ার আগে মোড়ল মাকড়সার পায়ে লুটিয়ে পড়ল, আমার ছেলেরা নেহাত বালক, ওরা ইচ্ছে
করে এ মহাপাপ করেনি। অজান্তে করে ফেলেছে। ওদের বাঁচান, ওদের বাঁচান ভগবানের রোষ
থেকে।



তখন মাকড়সা বলল, সে তো ঠিক কথা। কিন্তু বাপের মন কি তা বিশ্বাস করবে? আমি একজা বললে তাঁর সন্দেহ হবে। আপনারা এক কাজ করুন, আমার সঙ্গে শখানেক লোক দিয়ে দিন। তারা হবে আমার সাক্ষী।

গাঁয়ের সবাই এর ওর দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ এটাই একমাত্র উপায়। মাকড়সা তখন বলল, দেখবেন যেন বুড়োহাবড়া কচিকাচা সঙ্গে দেবেন না। স্বর্গের পথ বহুদূর। পথে পাহাড়পর্বত নদীনালা পেরোতে হবে। তাগড়া জোয়ান না হলে রাস্তাতেই সব মরে যাবে।

সবাই মানে কথাটা ঠিক। কাজেই গাঁ থেকে তাগড়া একশোজন জোয়ান বাছাই করে মাকড়সার সঙ্গে দেওয়া হল।

অতঃপর একশোজন জোয়ান নিয়ে যথাসময়ে মাকড়সা স্বর্গে উপস্থিত। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে ভগবানকে বলে, প্রভু আপনি যে আমাকে এক ছড়া ভুট্টা দিয়েছিলেন, তার বদলে আমি আপনার সেবার একশোজন দাস এনেছি। আমি যে আপনাকে কথা দিয়ে গিয়েছিলাম আজ তা পূর্ণ হল।

ভগবান তো যেমন অবাক তেমন খুশি। খুব সন্তুষ্ট হয়ে তিনি মাকড়সাকে দেবসেনাদের প্রধান পদ দিলেন। সেদিন থেকে মাকড়সার নতুন নাম হল শ্রেষ্ঠবুদ্ধি।



শ্রেষ্ঠবুদ্ধি

গাইয়ে দিপে

পুবসাগরের তীরে এক গাঁ। সেখানকার মেয়েরা রোজ বিকেলে সমন্বের ধারে বেড়াতে যায়। বালিতে ঘর বানায়। ঝিনুক কুড়োয়। সন্ধে হতে না হতে গাঁয়ে ফিরে আসে হাত ধরাধরি করে। একদিন একটি মেয়ে বেড়াতে গিয়ে কুড়িয়ে পেল মন্ত এক ঝিনুক। রংবেরঙের নকশাকাটা ভারী বাহারি। ঝিনুকটা হাতে নিয়ে সে যতই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে ততই ভাবে কী অপূর্ব। হঠাৎ মনে হয় এত সুন্দর ঝিনুক, যদি অন্য কেউ নিতে চায়। তাড়াতাড়ি একটা পাথরের তলায় লুকিয়ে রাখে। তারপর সঞ্জিনীদের সঙ্গে খেলায় মাতে। ঝিনুকটার কথা আর মনেই থাকে না।

খেলাধুলা সেরে ফেরার পথে প্রায় গাঁয়ের কাছাকাছি এসে পড়েছে এমন সময় তার খেয়াল হল, ওই যা, ঝিনুকটা যে ফেলে এলাম। তখন সঞ্জিনীদের বলে, একটা সুন্দর ঝিনুক রেখে এসেছি। চল না লক্ষ্মীটি নিয়ে আসি। যতই বলে কেউ রাজি হয় না। সামান্য একটা ঝিনুকের জন্য আবার এতটা রাস্তা ফিরে যাবে। পশ্চিমে সুয়িয় যে ডুবুডুবু। কালকে যখন বেড়াতে আসবে তখনই তো নিয়ে নিলে হয়। মেয়েটি ছিল যেমন জেদি তেমন ডাকাবুকো। বলে, আমি তবে একাই যাব। তোরা গাঁয়ে ফিরে যা। পেছন ফিরে সে সমন্বের দিকে হাঁটা লাগায়।

এদিকে দিনের আলো নিভে আসছে। চারিদিকে কেমন গা ছমছমে অন্ধকার। মেয়েটির মনটা একটু দমে যায়। ভয় ভোলবার জন্য জোর গলায় গান ধরে। এক মনে গাইতে গাইতে এসে পৌছোয় সেই পাথরটার কাছে যেখানে লুকিয়ে রেখেছে ঝিনুকটা। দেখে কি, পাথরটার পাশে মাটিতে রাখা মন্ত একটা পিপে। আর পাথরটার ওপরে ডানা গুটিয়ে বসে পাতলা একহারা চেহারার একজন লোক। মেয়েটি তো অবাক। ডানা তো পরিদের থাকে আর পরিবা সব অপরূপ রূপসি মেয়ে। জিজ্ঞাসা করে, তুমি কি পরি?

—হ্যাঁ। দেখছ না আমার ডানা আছে।

—কিন্তু তুমি তো ছেলে, মেয়ে নও তো! পরিবা সব মেয়ে হয়।

—তুমি ভুল জান পরিবা সব হয়। পরির দেশে মেয়ে পুরুষ ছেলে বুড়ো সব আছে। তা, মানুষের মেয়ে তুমি তো ভারী সুন্দর গান কর। খুব মিষ্টি গলা। এসো না এইখানটায় বসে একটা গান শোনাও তো। একটু সরে সে জায়গা করে দেয়। মেয়েটি স্বত্তির নিশাস ফেলে। নির্ভয়ে পরির কাছ যেঁসে বসে। অমনি পরি তাকে দু-হাতে জাপটে ধরে পিপেটার মধ্যে ফেলে ঢাকনা ঝঁটে দিল। ব্যস, পরির কারসাজিতে বন্দি হয়ে গেল ডানপিটে মেয়েটা। ঝিনুক নিয়ে তার আর গাঁয়ে ফেরা হল না।

এদিকে দুষ্টু পরি তো পিপেতে বন্ধ মেয়েটিকে নিয়ে দিব্যি ব্যাবসা ফেঁদে বসে। এ গাঁ থেকে ও গাঁ ঘুরে ঘুরে পিপেটার দৌলতে পয়সা রোজগার করে। যেখানেই যায় সেখানে



গিয়ে প্রথমে হাজির হয় সেখানকার হাটে বা বাজারে। লোকজন ডেকে বলে, এই যে বাবুমশাইরা সবাই শুনুন, শুনুন। আমার কাছে আছে এক ভানুমতীর খেলা, ভানুমতীর খেলা। যা আপনারা আগে কোথাও দেখেননি। আসুন আসুন। কৌতুহলী লোকজন তার চারপাশে ভিড় করে। তখন সে বলে, এই দেখছেন পিপেটা। এটা যেমন-তেমন পিপে নয়, গাইয়ে পিপে। অবিকল মানুষের মতো গান গায়। এমন চমৎকার গান কোনো বাঁশিতে বাজে না, কোনো পাথিতে গায় না। পাওয়া যায় শুধু মানুষের গলায়। আর এখন পাবেন এই পিপের মধ্যে থেকে। শুনবেন তো আসুন, পয়সা ফেলুন। পিপের গান শোনার জন্য লোকজন ভিড় জমায়। পরি লাঠি দিয়ে দুমদুম ঘা মারে পিপেটাকে আর বলে,

পিপে, পিপে গাইয়ে পিপে
খাস যদি তুই আমার নুন
গা তবে আজ খুলেই গলা
আমারই গুণ, আমারই গুণ।

অমনি পিপের মধ্যে থেকে ভেসে আসে কচি গলার অপরূপ গান। চারপাশে সকলে অবাক। কী মিষ্টি আওয়াজ, কী সুরেলা গলা। সবাই মোহিত। পরিকে কত লোকে টাকাপয়সা দেয়। অনেকে বাড়িতে ডেকে যত্নান্তি করে পাঁচপদ খাওয়ায়। পরির তো মহাফুর্তি। খাটুনি মেয়েটার আর পয়সার থলি বোঝাই হয় তার। দিনান্তে একবার একটু নিরিবিলি জায়গা দেখে পিপের ঢাকনা খুলে দু-মুঠো শুকনো ভাত মেয়েটাকে খেতে দেয়। আর ভয় দেখায়, ঠিকমতো যদি গান না গাস, যদি এতটুকু এদিক-ওদিক করিস তাহলে তোর সব রক্ত আমি চুষে খাব। আমি তোদের ওই ছবির রূপ দেখানো পরি নই। বুঝলি?

ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে পুবসাগর পাড়ের মেয়ে। কোথায় গেছে তার সেই সাহস। আধপেটা খেয়ে গালাগালি শুনে, মাসের পর মাস বন্দি থেকে বাবা-মায়ের আদরে লালিত তার জেদি ডানপিটে স্বভাবটুকুর অবশিষ্ট আর নেই।

ঘুরতে ঘুরতে একদিন পরি তার পিপে সহ হাজির মেয়েটিরই গাঁয়ে। ততদিনে গাইয়ে পিপের নামডাক চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তাকে হাটে দেখা মাত্র ছেলেবুড়ো মেয়েপুরুষ সব ঝেঁটিয়ে আসে। পরি তার অভ্যাসমতো যথারীতি ছড়া-টড়া বলে পিপেতে লাগায় দুই ঘা। শুরু হয় কচি গলার গান। এদিকে ভিড়ের মধ্যে ছিল মেয়ের বাবা-মা। তারা গান শোনে আর এর-ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। আরে, এ যেন তাদের হারিয়ে যাওয়া খুকির গলা! সেখানে সকলের সামনে তারা কিছু বলে না। গান শেষ হয়। সকলের বাহবা হাততালি। উপচে পড়ে পরির টাকার থলি। বাবা-মা চুপ করে দেখে। আর পাঁচজনের মতো পয়সা দেয়।

ভিড় পাতলা হয়ে গেলে তারা এগিয়ে দিয়ে পরির সঙ্গে কথাবার্তা বলে, তার জাদুর প্রশংসা করে। পরি তো খুশিতে ডগমগ। এবাবে তারা পরিকে নেমতন্ন করে নিজেদের বাড়িতে। পিপেটাকে গড়াতে গড়াতে খোশমেজাজে বলে পরি, এমন নেমতন্ন সে সব গাঁয়েই পায়।

নেমতন্ত্র খেতে বসে দেখে সব খাবারই তার মনের মতো। পেট পুরে খেয়ে শেষে দেখে এক গেলাস সরবতও। চোঁ চোঁ করে সরবতটুকু খেয়ে নিল। জবর খাওয়াটি হয়েছে। নড়াচড়া যাচ্ছে না। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। সে তো জানে না সরবতে কী মেশানো ছিল। দেখতে দেখতে সে ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ল।



বাবা-মা দৌড়ে গিয়ে পিপের ঢাকনাটা খুলে ফেলে। ওমা এই তো তাদের হারানিধি। এ কী হাল তাদের এত আদরের খুকুমণির। জামাকাপড় ছেঁড়াফাড়া নোংরা। শরীর বলতে হাড় কখনা জিরজির করছে। পিপের সঙ্গে গড়িয়ে গড়িয়ে তার সর্বাঙ্গে ক্ষত আর ব্যথা। মেয়েকে বুকে টেনে নিয়ে মাঝের চোখের জল আর থামে না। পরির বজ্জাতির কাহিনি শুনে বাবা তো রেগে আগুন। না, একে আচ্ছা মতো শিক্ষা দিতে হবে।

সোজা চলে যায় বাবা গাঁয়ের ওবার কাছে। সবাই তাকে খুব মান্য করে। তার মতো দাপট এ তল্লাটে পাঁচখানা গাঁয়ে কারো নেই। সবকথা শুনে ওবা তো গুম হয়ে বসে থাকে খানিকক্ষণ। বটে! গাঁয়ের মেয়ের এই হেনস্থা। পরি বলে যা ইচ্ছে তাই করবে। শেষে বলে, যাও, তোমরা বাড়ি গিয়ে পুরোনো জামাকাপড় একটা গাঁটির বানিয়ে রাখো। আমি আসছি।

ওবা নিজে যায় জঙ্গলের দিকে। একটু বাদে একটা ঝাঁপি হাতে মেয়েটির বাড়ি এসে ঢোকে। বাবা-মা এর মধ্যে পুরোনো কাপড়ের একটা বোঁচকা করে ফেলেছে। সেটাকে রাখা হল পিপের মধ্যে, তারপর ওবা এগিয়ে এল ঝাঁপিটা হাতে। সাবধানে সেটা পিপের খোলা মুখের কাছে উপুড় করে দিয়েই ঝাট করে ঢাকনা বন্ধ করে দিল ওবা। যাওয়ার সময় বাবা-মাকে উপদেশ দিয়ে গেল, মেয়েকে বাড়ির ভেতরের ঘরে লুকিয়ে রাখো। আর শয়তান পরিটার ঘুম ভাঙলে মিষ্টি কথায় বিদেয় করে দিয়ো।

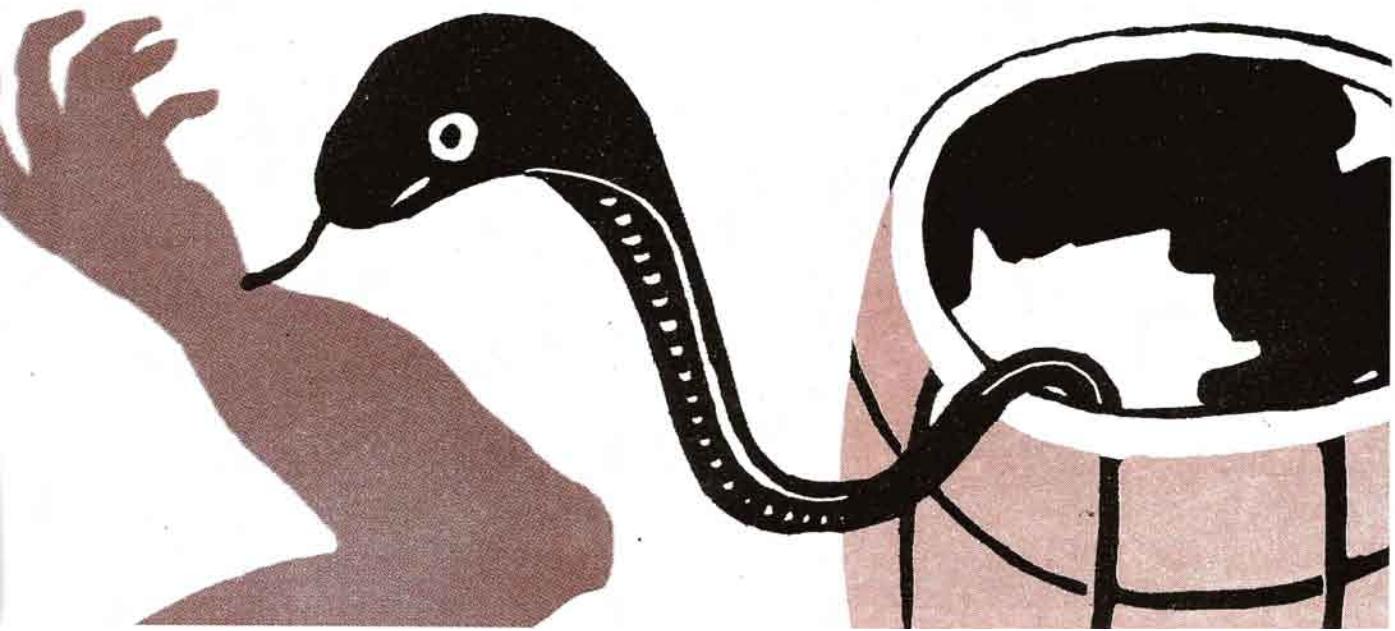
রাত পেরিয়ে পরদিন ভোরে ওষুধের ঘোর কাটে পরির। যা ঘুম ঘুমিয়েছে। এখন বাড়ির কর্তা-গিন্নির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পিপে সহ নিশ্চিন্ত মনে চলল নতুন গাঁয়ের সন্ধানে। বিকেল নাগাদ পৌছায় এক গঞ্জে। বাজারের মধ্যে লোকজন ডেকে পিপেটাকে লাঠির ঘা দিয়ে বলে,

পিপে পিপে, গাইয়ে পিপে
 খাস যদি তুই আমার নুন
 গা তবে আজ খুলেই গলা
 আমারই গুণ, আমারই গুণ।

কোনো আওয়াজ নেই, নেই সেই কচিগলার মিষ্টি গান। আরও জোরে লাঠির ঘা মারে। দমাদম। এবাবে যেন একটু শব্দ শোনো যাচ্ছে, হ্যাঁ কিন্তু শুধু হিস হিস। চারপাশে মানুষজন পরিকে টিটকিরি দিতে শুরু করে। ব্যাটা ভণ্ড, হিস হিস শুনিয়ে টাকা রোজগারের ফন্দি।

রাগে পরি তো চোখে অন্ধকার দেখে। পিপেটাকে প্রাণপণে পিটতে থাকে। কিন্তু কই, কোনো সুর, কোনো গান আর বেরোয় না। লোকেরা হাসাহাসি ঠাট্টাবিদ্রূপ করে সবাই এদিক-ওদিক চলে যায়। পরির মাথায় খুন চেপে গেছে। হতচাড়ি অবাধ্য মেয়ে, এমন বেয়াদবি! একদিনের রোজগার লোকসান, লোকের সামনে বেইজ্জত। দেখাচ্ছি মজা। হয় গান গাইবে নয় মরবে।

পিপেটাকে লাঠি মেরে মেরে গাঁয়ের সীমানার বাইরে একটা মন্ত পোড়ো জমিতে এনে ফেলে। এক ঘায়ে মেয়েটাকে শিক্ষা দিয়ে দেবে ঠিক করে লাঠি হাতে ঢাকনা খুলেই ঝাপিয়ে পড়ে পিপের ওপর। অমনি ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে হিস হিস করে ফণা তুলে এক ভয়ংকর কেউটে। সাক্ষাৎ যম। ওকার ঝাপি থেকে সে পিপেতে চালান হয়েছে। সারাদিন পিপেতে বন্ধ থেকে, লাঠি পেটার আওয়াজ শুনে শুনে, খিদেয় বিরক্তিতে তার মেজাজ তখন খুব খারাপ। ছোবলের পর ছোবলে সমস্ত বিষ ঢেলে দেয়। হাতের লাঠি হাতেই রয়ে যায় পরির। একটা ঘা মারারও সুযোগ মেলে না। বিষে নীল তার শরীরটা পড়ে থাকে পিপেরই পাশে। লোকে বলল দুষ্টু পরির উচিত শিক্ষা হয়েছে। এই ঘটনায় পরিরা খুব লজ্জা পেয়েছিল, কারণ দুষ্টু পরিটাকে পরিরাও দেখতে পারত না।



রাত্রের আলো

অনেক অনেক দিন আগে আমাদের এই পৃথিবীতে রাত্রির বেলাটা আরও বেশি অন্ধকার ছিল। সমস্ত আকাশ শুধু তারায় তারায় ঝলমল করত। কিন্তু তারাদের আলো পৃথিবীর মাটিতে কতদূর পৌছোয়? মানুষ আর জীবজন্মের কাছে রাতটা বড়ে অন্ধকার। সকলে ভাবে কী করা যায়?

পশুপাখিদের মধ্যে সে সময় বুদ্ধিমান বলে দাঁড়কাকের বেশ নামডাক। তার মতো চালাক আর কেউ নেই। এমনকী একটুআধটু জাদুও তার জানা। রাতের এই অন্ধকার কী করে দূর করা যায় তা নিয়ে সে মাথা ঘামাতে শুনু করল। অনেক খোঁজখবরের পর সে জানতে পারল উভরে বহুদূরে বরফগলা সমুদ্রে আছে এক দ্বীপ, সেখানে বাস করে এক জেলে। আর তারই কাছে আছে বাক্সে বন্ধ এক অতিসুন্দর আলো। নাম তার চাঁদ। দাঁড়কাকের মাথায় এখন শুধু একটাই চিন্তা, চাঁদটাকে কীভাবে হাতে পাওয়া যায়।

উড়তে উড়তে সে গিয়ে একদিন হাজির হল সেই উভরের দ্বীপে। বুড়ো জেলের কুঁড়ে ঘরের পাশে বুনো জামগাছের একটা ঝোপে আস্তানা গাঢ়ল। প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত তার কাজ বুড়ো জেলের কুঁড়ের ভেতর উঁকিবুঁকি মারা। কদিন নজর রাখার পর সে জানতে পারল



বুড়োর থাকবার মধ্যে আছে একটা মাত্র মেয়ে। বুড়ো নিজে মাঝেসাকে মাছ ধরতে বেরোয়। যা দু-চারটে আনে তাই ঘরের চালে রেখে দেয়। ঠান্ডার দেশ, দিবি থাকে। আর মেয়েটা সকালে বেরিয়ে ঝোপঝাড় থেকে শাকপাতা তোলে, ফলটল পাড়ে, বরফঠাণ্ডা মাটি খুঁড়ে খাওয়ার মতো শিকড়বাকড় কন্দমূল আনে। তারপর কাঠকুটো জোগাড় করে ঘরে ফিরে তার আর বাপের রান্না চড়ায়।

বেশকিছুদিন ধরে দাঁড়কাক বাপ-মেয়ের গেরস্থালি দেখে। অনেক ভাবনাচিন্তার পর একটা ফন্দি তার মাথায় আসে। এমনি এমনি কার্যসিদ্ধি হবে না, জাদু চাই জাদু। লাগ্ ভেল্কি, লাগ্ ভেল্কি লাগ্! ব্যস। কোথায় দাঁড়কাক? এক থোকা রসালো জামের মধ্যে একটি জাম হয়ে সে ততক্ষণে বুলে পড়েছে জাম গাছের ডালে।

পরদিন সকালে জেলের মেয়ে এসেছে জাম তুলতে। বড়ো বড়ো থোকা রসালো জাম। সব মগডালে। হাঁ করে তাকিয়ে জেলের মেয়ের তো জিভে জল। যেই না পায়ের পাতায় ভর দিয়ে হাত লম্বা করে ওপরের ডাল ধরে প্রাণপণে ঝাঁকুনি দিয়েছে অমনি ঝুপঝুপ করে পড়তে লাগল পাকা জাম। আর তাদের সঙ্গে সেই জামটাও টুপ করে খসে দুকে গেল মেয়েটির হাঁ করা মুখে, সোজা চলে পেটে গেল।

দিন যায় মাস যায়। জেলের মেয়ের কোলে এল একটি ছেলে। আশ্চর্য, এমন ফরসা মায়ের ছেলে কিনা এমন কুচকুচে কালো! মায়ের নাকটি বোঁচা, ছেলের নাকখানা ইয়া লম্বা। আবার একটু ঝাঁকানো। অনেকটা দাঁড়কাকের ঠোটের মতো।

দিনে দিনে ছেলে বাড়ে। পাশ ফেরে, উঠে বসে, হামা দেয়। মুখে আসে আধো আধো বুলি। এখন শুরু হয় এক বামেলা। জেলের মেয়ে অবাক হয়ে দেখে রোজ সকাল থেকে তার ছেলে হামাগুড়ি দিয়ে ঘরের কোণে রাখা বাক্সের সামনে বসে থাকে। ছেট্ট ছেট্ট নরম হাতদুটিতে দুমদুম করে পেটে বাক্সের ঢাকনাটা। তার সঙ্গে সমানে কান্না। প্রথম প্রথম তার বায়নায় জেলে বা তার মেয়ে কেউই বিশেষ কান্টান দেয়নি। কিন্তু যত দিন যায় ততই বেড়ে চলে খোকার কান্না। আরও জোরে সারাক্ষণ দমাদম পেটে বাক্সের ঢাকনাটা। মা বোঝায়, ওরে এ বাক্স খুলতে নেই। ওটা আমার ঠাকুরদা পেয়েছিল তার ঠাকুরদার কাছ থেকে। তার ঠাকুরদা পেয়েছিল তার ঠাকুরদার কাছ থেকে। এমন করে কত পুরুষ ধরে আছে আমাদের বংশে। ছিঃ সোনা, অমন করে না। তুমিও বড়ো হলে বাক্সটা পাবে।

কিন্তু ছেলে অবুব। সে সমানে কাঁদে আর বাক্স পেটায়। শেষে একদিন জেলেবুড়ো মেয়েকে ডেকে বলল, ওরে বাক্সটা খোল। ওর ভেতরে আছে একটা আলোর বল। তাকে বলে চাঁদ। বের করে দে আমার দাদুভাইকে। না হয় খেলাই করুক ওটা নিয়ে।

মা যেই বাক্সটা খুলতে বসল অমনি ছেলের কান্না বন্ধ। একমনে দেখে মায়ের কাজকর্ম। বাক্স খোলার পর বেরোল আর একটা বাক্স। তার ভেতর থেকে আরও একটা। এমনি করে পর পর নটা বাক্স পাওয়া গেল। প্রত্যেকটা কী সুন্দর! রংবেরঙের চমৎকার কাজ সারা গায়ে। খোকা

কিন্তু সেগুলোর একটাকেও ছুঁল না। সে খালি অপেক্ষা করে আছে তারপর কী বেরোয়। দশ নম্বর বাঞ্চের মধ্যে থেকে বেরোল একটা জালির থলে। তার মুখ খুলতে না খুলতেই সারা ঘর বুপোলি আলোয় আলো। সাদা ধৰথবে একটা বলের মতো জিনিস মা সাবধানে বের করে ছুঁড়ে দিল ছেলের দিকে। অতটুকু শিশু হলে কী হয়, দিব্য খপ করে তার ছেট ছেট দুটি হাতে লুফে নিল বলটা, ব্যস, তারপর থেকে সব কানাকাটি বন্ধ। ছেলে একেবারে শান্ত। সারাদিন চাঁদ নিয়ে খেলায় মেতে থাকে। জেলে আর তার মেয়ে তো হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

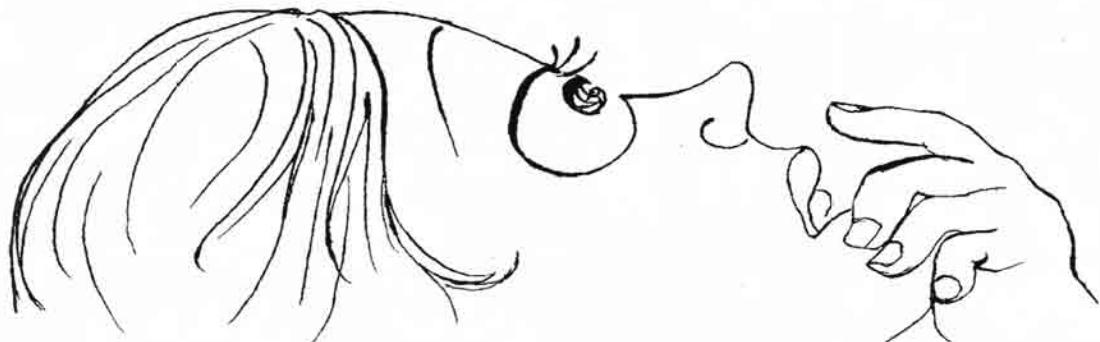
কিছুদিন ভালোয় ভালোয় কাটে। তারপর আবার শুরু ছেলের কানা। দিনরাত ঘ্যানঘ্যান ঘ্যানঘ্যান। আধো আধো কথায় কী যে চায় কেউ বুঝতেই পারে না। দিন দিন বেড়ে চলে তার কানা। শেষে প্রায় নাওয়া-খাওয়া ঘুমটুম বন্ধ হওয়ার জোগাড়। মা হয়রান, দাদু নাস্তানাবুদ। মেয়েকে ডেকে বারবার বুড়ো বলে, ওরে, ভালো করে ধৈর্য ধরে একটু শোনার চেষ্টা কর না, দাদুভাইয়ের কীসের কষ্ট। দেখ না কী চায় ছেলেটা।

মা তো শাকপাতা ফলমূল কুড়ানো, রান্নাবান্না, ঘরের পাট সব বন্ধ করে ছেলের কথা বোঝার চেষ্টায় লাগে। অনেকক্ষণ ধরে শুনেটুনে জেলের মেয়ের তো মাথায় হাত।

—একী উন্ট বায়না! জানো বাবা, নাতি তোমার বলে কিনা রাতের তারাভরা আকাশ দেখবে। এই বরফজলে ঘেরা কনকনে শীতের দেশ, ঘরে আমাদের জানলা পর্যন্ত নেই। রাতে আমরা ঘরের অধিসম্মিং বন্ধ করে রাখি ঠাণ্ডার ভয়ে। এর মধ্যে এ ছেলে কোথা থেকে তারাভরা আকাশের কথা জানল? আর তারাভরা আকাশ দেখে কী এমন রাজ্য জয় হবে। আমারই কপালে জুটেছে এমন খামখেয়ালি পুত্রুর।

মা চটেমটে লাল। সারাটা দিন তার মাঠে মারা গেছে। এখন এই বিদ্যুটে আবদার সামলানো। দাদু তো হতভম্ব। কোলে নিয়ে নাতিকে তোলাতে চেষ্টা করেন। দিন যায়। ছেলের কানা আর বায়না চলতেই থাকে। চলতেই থাকে। খাওয়াদাওয়া মাথায় উঠেছে। তার কালো চকচকে নাদুসন্দুস শরীর আধখানা হয়ে এল। মা দিশেহারা। দাদুর আর সহ্য হয় না। শেষে মেয়েকে ডেকে একদিন বলল, ওরে ওই যে ছাদের কোণে গর্তটা আছে, যেখান দিয়ে ঘরে আগুন জ্বাললে ধোওয়া বেরোয়, সেটাকে একটু না হয় বড়ো করে দে। দাদুভাই তার ভিতর দিয়ে তারাভরা আকাশ দেখুক। এতই যখন সাধ, কী আর করা!

অগত্যা জেলের মেয়ে অনেক কষ্ট করে ছাদে উঠে কাঠের পাটা সরিয়ে বড়ো করে গর্তটা। তারপর আস্তে আস্তে সাবধানে নেমে এসে খোকাকে খুঁজতে থাকে। দু-হাতে তাকে ওপরে তুলে





ধরে গর্তের মধ্য দিয়ে দেখাবে তার এত সাধের তারাভরা আকাশ। কিন্তু ও মা, কী আশ্চর্য কাণ্ড! খোকা কই? জেলের মেয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে তার ছেলেকে খুঁজতে থাকে।

হঠাতে ডানার শব্দে ওপর দিকে তাকাতেই সে দেখতে পেল ছাদের ধোওয়া-যাওয়া গর্ত দিয়ে হু-স করে বেরিয়ে যাচ্ছে মিশমিশে কালো এক মন্ত দাঁড়কাক। তার লম্বা ঠোঁটের ফাঁকে ধরা চাঁদ।

দাঁড়কাক সোজা উড়তে উড়তে গিয়ে বসে একটা উঁচু পাহাড়ের চুড়োয়। সেখান থেকে প্রাণপণ শক্তিতে চাঁদটাকে বলের মতো ছুঁড়ে দেয় ওপরে।

সেই থেকে চাঁদ আকাশে ঘূরছে তো ঘূরছেই। আর এই কারণেই আজও আমরা রাতের বেলা পাই ফুটফুটে জ্যোৎস্না।

କୀ ସାହଦୁର ମାନୁଷ !

ପୃଥିବୀ ତୈରି ହେଉଥାର ପର ଦେବତାରା ଏଖାନେ ବାସ କରତେ ପାଠାଲେନ ଏକ ଅଳ୍ପ ବୟାସି ମାନୁଷକେ । ନାମ ତାର ବିଲ୍ଟୁ । ଶିକାର ଚାଷବାସ କିଛୁଇ ତାର ଜାନା ନେଇ । ତବେ ତାର ସଙ୍ଗେ ଆଛେ ଏକଟା ଗୋରୁ । ଏଖାନେ-ମେଖାନେ ଗୋରୁଟା ଆପନମନେ ଘୁରେ ବେଡ଼ାଯ । ମନେର ସୁଖେ ଖେଯେ ବେଡ଼ାଯ ଘାସପାତା ଗାଛଗାଛାଲି । ଗୋରୁର ସତ୍ତ୍ଵାତ୍ମି କିଛୁଇ ବିଲ୍ଟୁର ଜାନା ନେଇ । ଖାଲି ଏକଟି ଜିନିସ ତାର ଜାନା, ଗୋରୁର ଦୂଧ ଦୋଷ୍ୟା । ଗୋରୁର ଦୂଧ, ଗାଛେର ବୁନୋ ଫଳ, ମାଟିର ତଳାଯ କନ୍ଦମୂଳ ଖେଯେ ଦିବି ତାର ଦିନ କାଟେ । ଏକଦିନ ସ୍ଵର୍ଗେର ରାଜା ଗୁଲୁର ମେଯେ ନାସ୍ତି ଏଲ ବେଡ଼ାତେ ମାଟିର ପୃଥିବୀତେ । ତାର ଭାରୀ ଭାଲୋ ଲେଗେ ଯାଯ ମର୍ତ୍ତ୍ୟେର ଗାଛପାଲା ନଦୀନାଲା ପାହାଡ଼ପର୍ବତ । ସବଚେଯେ ମନେ ଧରେ ମାଟିର ମାନୁଷଟିକେ । ବିଲ୍ଟୁରେ ନାସ୍ତିକେ ବଡ଼ୋଇ ପଛନ୍ଦ । କିନ୍ତୁ ସ୍ଵର୍ଗରାଜ ଗୁଲୁର ଭୟଂକର ମେଜାଜ । ନାସ୍ତିର ସାହସ ହଲ ନା ବିଲ୍ଟୁକେ ବିଯେ କରେ ପୃଥିବୀତେ ଯାଯ । ଅଗତ୍ୟା ଘରେର ମେଯେ ମାନେ ଘରେ ଫିରେ ଗେଲ ।



নান্মি স্বর্গের দেবী। হলে হবে কি, এখন সবসময় মনমরা। মুখে হাসিটি নেই। বিল্টুকে সে ভোলে না। মা বার বার জিজ্ঞাসা করেন, কীরে, কী হয়েছে? একদিন নান্মি মাকে বলে বসে সে মাটির মানুষ বিল্টুকে বিয়ে করতে চায়।

দেখতে না দেখতে কথাটা দেবতা মহলে চাউর হয়ে গেল। সবাই তো একেবারে ছি ছি করতে লাগল। আকেল দেখো মেঝেটার। রাজকুমারী বলে কথা। তাকে বিয়ে করার জন্য স্বর্গ আলোকরা এত সব ডাকসাইটে হোমরাচোমরা দেবতা মুখিয়ে আছে। কোথায় এদের মধ্যে নিজের পছন্দসই কাউকে মালা দেবে, তা না, কোথাকার একটা কে, তাকে বিয়ে করতে চায় স্বর্গের রাজকন্যা। এ পাত্রের না আছে রাজপাট, না আছে সোনাদানা ঘরবাড়ি। থাকার মধ্যে আছে খালি একটা গোরু। এদিকে বিদ্যেবুদ্ধি অষ্টরঙ্গা, চাষবাস তো দূরের কথা, রান্না পর্যন্ত জানে না। এর সঙ্গে বসবাস করবে আমাদের রাজকুমারী! যার অঙ্গে সর্বদা চমকদার রেশমি পোশাক, যার শয়্যা এই পুরু গদির ওপর দুধ সাদা চাদরে। চারবেলা হরেকরকম পদ রান্না হয় তার জন্য। মহারানি স্বয়ং সেইসব খাবার রাজকুমারীর মুখের সামনে সাজিয়ে ধরেন। আদরের মেয়ে খেয়ালখুশি মতো কখনো এটা একটু চাখে, কখনো ওটা একটু মুখে দেয়। যখন হেঁটে চলে বেড়ায় তার গা-ভরা গহনার বালমলানিতে সবার চোখ ধাঁধিয়ে যায়। আর এই মেয়ে কিনা বিয়ে করবে চাল নেই চুলো নেই এক লক্ষ্মীছাড়া মানুষকে। এ হতেই পারে না।

দেবতারা সবাই এক জোট হয়ে বিল্টুকে জন্ম করার ফন্দি আঁটে। তারা জানে বিল্টুর সব আশা-ভরসা ওই গোরুটা। একদিন স্বর্গরাজ গুলুর হুকুমে তারা গোরুটাকে চুরি করে নিয়ে আসে স্বর্গে। বেচারা বিল্টুর তো বড়েই মুশকিল। শুধু জংলি ফলমূল খেয়ে তার পক্ষে প্রাণবাঁচানো দায়। এদিকে মেয়েকে শায়েন্টা করার জন্য গুলু কড়া পাহারা বসিয়েছে। খবরদার মেয়ে যেন স্বর্গের সীমানার বাইরে পা না বাঢ়ায়।

নান্মি কিন্তু মোটেই দমবার পাত্রী নয়। সবরকম চৌকিদার নজরদার সিপাইসন্ত্রির চোখ এড়িয়ে সে পৃথিবীতে হাজির। বিল্টুকে বলে, তোমার গোরুটা স্বর্গের গোশালায় এনে রেখেছে। তুমি যদি এসে তাকে উদ্ধার করে নিজের ক্ষমতা জাহির করতে পার, তাহলেই তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। আর কোনো উপায় নেই।



খবর দিয়েই নাম্বি তাড়াতাড়ি স্বর্গে ফিরে যায়। যাতে কেউ টের না পায় যে, সে পৃথিবীতে এসেছিল।

বিল্টু অনেক ভাবনাচিন্তা করে কূল পায় না। বেচারির বড়োই দুর্দশা। নাম্বীর কথাও ভাবে, গোরুটাও উদ্ধার করতে হবে। কিন্তু এভাবে বসে বসে ভাবলে তো হবে না। অতঃপর স্বর্গের পথে হাঁটা লাগায়। যাচ্ছে তো যাচ্ছে, যাচ্ছে তো যাচ্ছে। অবশ্যে পৌছোয় স্বর্গের দরজায়। মন্ত্র সিংহদ্বার সোনার মতো ঝকঝক করছে। ভয়ে ভয়ে ভেতরে ঢুকে বিল্টু তো একেবারে থ। কী বিশাল সব প্রাসাদ, চতুর্ভুক্ত বাঁধানো রাস্তা। চারিদিকে সবকিছু সাজানোগোছানো পরিষ্কার তকতকে রঙেরূপে ঝলমল। দেখেশুনে বিল্টুর তো মাথা ঘুরে গেল।

এদিকে দ্বাররক্ষীরা রাজাকে বিল্টুর স্বর্গে আসার খবর সঙ্গে সঙ্গে পৌছে দিয়েছে। চারিদিকে সাড়া পড়ে গেছে। সেপাইরা তাকে বেঁধে নিয়ে হাজির করে স্বর্গরাজ গুলুর সামনে। স্বর্গরাজ বললেন, ওহে যুবক, স্বর্গের রাজকুমারীকে কি এমনি এমনি বিয়ে করতে পারবে? শক্তি পরীক্ষা দিতে হবে। তাতে যদি উত্তরোত্তে পার তবেই বিয়ে হবে। যাও, এই রাজকুমারদের সঙ্গে যাও। এরা তোমাকে দেখিয়ে দেবেন কী করতে হবে। মনে রেখো, পাশ না করতে পারলে কিন্তু গর্দান যাবে। মানুষ হয়ে তুমি স্বর্গে ঢুকেছ। হয় দেবতাদের সঙ্গে পাল্লা দেবে, নয়তো আর মানুষ থাকবে না। যাও, ঠাঁদের সঙ্গে যাও।

রাজকুমাররা বিল্টুকে রাজবাড়ির বাইরে একটা মন্ত্র হল ঘরে নিয়ে আসে। সেখানে বিরাট লম্বা একটা টেবিল। তার ওপর কত খাবার। আট-দশ রকমের মাছ, তিন-চার পদ মাংস, তরিতরকারি তো গুণে শেষ করা যায় না। কত অজানা রংবেরঙের ফলের রাশি, পাশে হাঁড়ি হাঁড়ি মিষ্টি। সুগন্ধী শরবতের গেলাস এক সারি। বড়ো রাজকুমার বিল্টুর বাঁধন খুলে দিতে আদেশ দেয়। তারপর তাকে টেবিলের কাছে নিয়ে গিয়ে বলে, শোনো, এই যে দেখছ টেবিলের ওপর এত খাবার, এ স-ব তোমাকে একলা খেয়ে শেষ করতে হবে। সময় এক বেলা। তারপর আমরা এ ঘরে আসব। যদি একটুকরো খাবারও পড়ে থাকে তাহলে প্রাণ নিয়ে এঘর থেকে বেরোতে পারবে না।

বলে রাজকুমাররা চলে যায়। সেপাইরা বিল্টুকে একলা ঘরে রেখে বাইরে থেকে তালাচাবি বন্ধ করে দেয়। সকলের কী ফুর্তি। এই পরিমাণ খাবার খেতে হলে ব্যাটা পেট ফেটেই মরে যাবে। পৃথিবীর সামান্য মানুষ হয়ে স্বর্গের রাজকুমারীকে বিয়ে করার শখ ওর চিরদিনের মতো মিটে যাবে। বামন হয়ে চাঁদ ধরতে যাওয়ার স্বপ্ন!

সত্যি কথা বলতে কী, প্রথমটায় এত খাবার দেখে বিল্টু বিশেষ ঘাবড়ায়নি। একেই তো এমন সুখাদ্য তার কল্পনার বাইরে। তার ওপর এতদিন কষ্ট করে আধপেটা থাকা। কাজেই টেবিলের দিকে তাকিয়ে তার জিভে জল এসে গেল। একটা চেয়ার রাখা ছিল। সেটাকে টেনে আরাম করে বসে বিল্টু মহানন্দে হাপুসহুপুস গবগব করে থেতে থাকে। যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। কিন্তু মানুষের পেটে কতটুকুই বা আর জায়গা। খানিকটা পরেই তার মনে হল যেন আকর্ষ ভরে গেছে। এক ফেঁটা জলও আর পেটে আঁটবে না।



এদিকে টেবিলময় তখনও পড়ে আছে রাশি রাশি খাবার। বিল্টু মনে মনে ভাবল, কিছুতেই এত খাবার খাওয়া তার একার পক্ষে সন্তুষ্ণ নয়। কিন্তু সব খেয়ে শেষ করতে না পারলে প্রাণটি দিতে হবে। কী করা। ভাবল ঘরটা তো মস্ত। দেখি চারিদিকে ঘুরে বেড়িয়ে যদি পেটটাকে একটু খালি করা যায়। তাহলে আবার খাওয়া যাবে। ঘরের চৌহদ্দির মধ্যে পায়চারি করতে থাকে। হঠাৎ একটা কোণে হোচ্চট খেয়ে প্রায় পড়ে যেতে যেতে সামলে নিয়ে নজর করে দেখে, কাঠের মেঝেতে এক জায়গায় দুটো পাটাতনের জোড়ায় একটু চিড় খেয়ে গেছে। বিল্টু পৃথিবীর রোদে পোড়া জলে ভেজা শক্তপোক্ত মানুষ, মাটি খুঁড়ে তাকে মূলকন্দ খুঁজতে হয়। তাই তার হাত দুটোতে যেমন জোর, চামড়াও তেমনি শক্ত, যেন হাতিয়ার। পটাস করে খালি হাতেই সে কাঠের পাটাতনটা আরও খানিক ভেঙে ফেলে। মেঝেয় তৈরি হয় গর্ত। গর্তের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় নীচে মাটি। আসলে ঘরটা ছিল কাঠের। তাই ইঁট পাথরের বাড়ির মতো সোজা মাটিতে গাঁথা নয়। কাঠের চারচারটে খুঁটির ওপর কাঠের কাঠামো তৈরি করে তার ওপর ঘরটা দাঁড় করানো। তাই মেঝে ও মাটির মধ্যে কয়েক হাত ফাঁক।

বিল্টুর মাথায় অমনি বুদ্ধি খেলে গেল। বাকি যত মাছমাংস ফলমিষ্টি শরবত ছিল সব এনে ঢেলে দিতে থাকে ফোকরে। মিনিট কয়েকের মধ্যে টেবিল একদম পরিষ্কার। এখন বিল্টুর সমস্যা গর্তটা কী দিয়ে বোজাবে। ঘরময় সাজানো সারি সারি ফুলগাছের টব। রংবেরঙের বাহারি সব ফুল ফুটে আছে। কিন্তু সেসব দেখার মন নেই তখন বিল্টুর। বেশ বড়ে দেখে একটা টব টেনেছিঁচড়ে গর্তটার ওপরে সাবধানে বসায়। কী ভাগ্য টবটা দিব্যি গর্তটাকে পুরো ঢেকে দেয়।

নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে সে। বাকি টবগুলোকে এদিক-ওদিক সরিয়ে মানানসই করে রাখে। যাতে এই টবটার ওপর কারো নজর না পড়ে। ওটা বেমানান না লাগে। একেই বেদম খাওয়া হয়েছে তার ওপর এতসব টানাটানির মেহনত। ভারী ক্লান্ত বোধ করে বেচারা বিল্ট। একটু জিরিয়ে না নিলে চলছে না। মেঝেতেই ঘুমিয়ে পড়ে সে।

ঘণ্টা দুয়েক টানা ঘুম দিয়ে উঠে তরতাজা লাগে শরীরটা। এরপর সে ঘরের চারিদিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখে। না, সব ঠিকঠাক। এবারে হাসি হাসি মুখে দরজায় ধাক্কা দিতে থাকে, ওহে দেবগণ, আসুন আসুন, দেখুন আপনাদের খাবারদাবার সব খেয়ে শেষ করে দিয়েছি। থালাবাসন একেবারে সাফ।

বিল্টুর হাঁকডাকে দৌড়ে আসে স্বয়ং দেবরাজ গুলু আর তার ছেলেরা। ঝানাঝ করে তালাটা খুলে ফেলে দেখে, তাই তো! এত মাছ মাংস তরকারি ফলমিষ্টি শরবত, স-ব উধাও! ওই এতটুকু পৃথিবীর মানুষের পেটে এত জায়গা! সকলের তো চোখ কপালে, মুখে বাক্যি নেই। পেটে হাত বোলাতে বোলাতে বিল্ট মুচকি হেসে বলে, না, খাওয়াটা মন্দ হল না। তা ঠিকই করেছেন। হবু জামাইকে ভালোমন্দ খাওয়াবারই তো কথা।

বিল্টুর ঠাট্টায় দেবতাদের চমক ভাঙে। তাই তো, এ যে এখনও রাজকুমারীকে বিয়ের স্বপ্ন দেখছে। না, যে করেই হোক একে ঠেকাতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা পরীক্ষা বিল্টুর জন্য ভেবে ফেলে দেবতারা। একটা তামার কুড়ুল তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে মেজো রাজকুমার বলল, ওহে বাপু, ওই যে দূরে দেখছ ন্যাড়া পাহাড়টা, এই কুড়ুলটা দিয়ে ওখান থেকে আমাদের রান্নার জন্য এক ঝুড়ি জ্বালানি পাথর কেটে নিয়ে এসো তো। বিল্টু ছেলেমানুষ হলে কী হয়, ঘটে বুদ্ধি ধরে। ফস করে প্রশ্ন করে সে, পাথর আবার জ্বালানি হয় নাকি?

স্বর্গরাজ তো রেগে টৎ। এত আশ্পর্ধা, দেবতাকে প্রশ্ন করে! দাঁত কিড়িমিড় করে তিনি বললেন, দেখো হে ছোকরা। তুমি মানুষ, আমরা দেবতা। যা হুকুম করব তাই তোমাকে করতে হবে। পাথরে জ্বালানি হয় কি না এ নিয়ে তোমায় মাথা ঘামাতে হবে না। বেশি মাথা ঘামালে মাথাটি কেটে রাখব।

এদিকে বিল্টুর তো বুক ধুকপুক। পরীক্ষা থেকে নিষ্ঠার পাওয়া যে কত কঠিন তা এখন সে বিলক্ষণ টের পাচ্ছে। তবু বীরপুরুষের মতো বুক ফুলিয়ে বলে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। অত কথায় কাজ কী। কই, দিন দেখি আপনাদের ঝুড়ি। কত পাথর চান কেটে আনছি।

ঝুড়ি আর কুড়ুল নিয়ে বিল্টু পাহাড়ের তলায় এসে পৌঁছোয়। পাহাড়ের গায়ে এখানে-ওখানে বেশ কবার ঘা মারে। নাঃ একেবারে নিরেট পাথর। দাগ পর্যন্ত পড়ে না। আরও জোরে মারলে হয়তো কুড়ুলটাই ভেঙে দুখান হবে। কী যে করে। বিল্টু আরও কবার চেষ্টা করে। কিন্তু সেই একই ফল। এতটুকু পাথরও ভাঙে না। বিল্টু তো হতাশ হয়ে মাটিতে বসে পড়ে।

এদিকে আস্তে আস্তে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে চলেছে। সারাদিন রোদে তেতে পাথরের গা থেকে বেরোচ্ছে অসহ্য তাপ। বিল্টু ভাবল, পাহাড়টার চুড়োয় গিয়ে বসি, ওখানে একটু হয়তো হাওয়া পাওয়া যাবে। গরম পাথরের গা বেয়ে বেয়ে সে উঠে আসে একেবারে পাহাড়ের মাথায়। বেশ একটা ছোটো চাতালের মতো জায়গা। অতটা যেন গরম নয়। একটু একটু ঠান্ডা বাতাস বইছে। জামাটা খুলে হাত-পা ছড়িয়ে বসতে যাবে এমন সময় তার চোখে পড়ে বিরাট একটা ফাটলের রেখা পাহাড়টাকে প্রায় দু-ভাগ করে ফেলেছে।

বিল্টুর মাথায় একটা মতলব ঝিলিক দিয়ে ওঠে। এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠে সেই রেখা বরাবর যেই না দিয়েছে কুড়ুলের এক ঘা, অমনি কড়কড়কড় কড়াৎ করে একটা বিরাট পাথরের ঢাই ভেঙে চুরমার। একরাশ ছোটো-বড়ো পাথরের টুকরো ছিটকে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ল তলায় চারিধারে। বিল্টু তো খুশিতে ডগমগ। শরীরে তার নতুন জোর। দুমদাম কুড়ুলের ঘা মারে ফাটল বরাবর আর খণ্ড খণ্ড পাথর ভেঙে গড়িয়ে মাটিতে জমা হয়। দেখতে না দেখতে পাহাড়ের তলায় পাথরের ঢাই। বিল্টু পাহাড়ের চুড়ো থেকে নেমে আসে। ঝুড়িতে ভরতি করতে দিয়ে দেখে, ও বাবা, এ যে মেলা পাথর হয়ে গেছে। ঝুড়িতে ধরছে না। বিল্টু চলল গুলু আর তার ছেলেদের কাছে।

এদিকে স্বর্গরাজ তো দেবতাদের নিয়ে নিশ্চিন্তে বসে। ব্যাটা মানুষ এইবার জন্ম হয়েছে। কীভাবে তাকে শান্তি দেওয়া হবে তারই আলোচনা চলছে। এমন সময় দিব্য নিশ্চিন্ত মুখে বিল্টু হাজির।

সে বলল, ও রাজামশাই, মনে হচ্ছে অনেক বেশি পাথর ভাঙা হয়ে গেছে। আপনার ওই একখানা ঝুড়িতে আঁটছে না। আর কখানা ঝুড়ি দিন তো। শুনে তো দেবতারা দৌড়ে আসে পাহাড়ের কাছে। একী, সত্যি তো টুকরো পাথরের একেবারে স্তুপ হয়ে গেছে। এবারে তারা বেশ ঘাবড়ে গেল। পৃথিবীর মানুষটা তো দারুণ কাজের! তার কাছে সব অসম্ভই সম্ভব।

বিল্টু আবার শান্ত মুখে বলে, তা এবারে বিয়ের জোগাড়যন্ত্র করতে শুরু করুন।

দেবতাদের সম্বিং ফেরে। তাই তো! আমাদের মেয়ে যে এবারে সত্যি সত্যি হাতচাড়া হবার জোগাড়। সবাই মিলে তাই তড়িঘড়ি মাথা ঘামিয়ে আর একটা পরীক্ষার মতলব ঢাঁটে ফেলল। এবারে স্বয়ং গুলু বিল্টুর হাতে একটা হাঁড়ি দিয়ে বললেন, যাও তো হে, এই হাঁড়িতে করে জল নিয়ে এসো। দেখো যেন সমুদ্রের জল, নদীর জল, দিঘির জল, ডোবা বা পুকুরের জল, কুয়োর জল কি বৃষ্টির জল এনো না। আমার চাই শুধু বিন্দু বিন্দু জমে থাকা জল। অর্থাৎ কিনা শিশির। যাও। যদি আনতে না পার, তাহলে সিধে গর্দান।

দু-দুটো অসাধ্য সাধন করে বিল্টু নিজেকে খুব কেউকেটা মনে করছিল। এক হাঁড়ি শিশির এনে দিতে না পারলে ঘ্যাচাং করে মুঞ্চু কাটা যাবে শুনে তার মুখের হাসি নিমেষে মিলিয়ে গেল। কিন্তু ভয় পেয়েছে স্বীকার করার ছেলেই বিল্টু নয়। মাথা উঁচু করে বুক ফুলিয়ে সে বলল, এ আর কী। নিশ্চয় নিয়ে আসব এক হাঁড়ি শিশির। তবে এখন তো সন্ধে হতে চলেছে। অন্ধকারে

খোঁজাখুঁজি করা যাবে না। কাল সকালে আলো ফুটতে ফুটতে হাজির করে দেব এক ইঁড়ি শিশির।

গুলু আর দেবতারা তাতেই রাজি। সকলেই ভাবল ব্যাটা রাতের বেলা পালিয়ে যেতে তো আর পারবে না। সিংহদুয়ারে ঝুলছে পেঁচায় তালা, চারিদিকে কড়া পাহারা। পালানোটা মুখের কথা নয়। এই ভেবে সবাই নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করতে চলে গেল।

এদিকে বিল্টু চলে ইঁড়ি নিয়ে। কোথায় যাবে কী করবে কিছুই মাথায় আসছে না। ভাবে ধুতেরি ছাই, যেদিকে দু-চোখ যায় সেদিকেই যাই। যেতে যেতে শহর ছাড়িয়ে এসে পড়ে এক মস্ত বাগানে। পা আর চলছে না। একট বড়ো ঝাঁকড়া গাছ দেখে তার তলায় ঘাসে ধূপ করে বসে পড়ে। চারিদিকে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা। ঘন ঘাস হয়ে রয়েছে। বিল্টু পা মেলে দেয়। পাশে রাখে ইঁড়িটা। পরীক্ষা দিতে দিতে প্রাণান্ত। এখন আবার এই নতুন পরীক্ষা। রাজার মেয়েকে ভালোবেসে কী বিপদেই না পড়েছে। ভাবনায় চিন্তায় ক্লান্তিতে তার দু-চোখ বুজে আসে। দেখতে দেখতে ঘুমে কাদা।

রাত ফুরিয়ে ভোর হয় হয়। চারিদিক ফরসা হয়ে আসে। দু-একটা করে পাখি ডাকতে শুরু করে। ঘুম ভাঙল বিল্টুর। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখে গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে পরিষ্কার আকাশ দেখা যাচ্ছে। কী সুন্দর সকাল! একট যেন শীত শীত করছে। আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসে বিল্টু। হঠাৎ মনে পড়ে, এক ইঁড়ি শিশির স্বর্গের রাজাকে না এনে দিতে পারলে তার গর্দান যাবে। তড়ক করে লাফিয়ে ওঠে বিল্টু। তাই তো! সে দিব্য ঘূমিয়ে রাত কাবার করে ফেলল, এদিকে শিশিরের কোনো ব্যবস্থাই হল না। এদিক-ওদিক তাকায়, কোথায় রেখেছিল ইঁড়িটা? ওইতো এক পাশে পড়ে আছে। তাড়াতাড়ি ইঁড়িটা তুলতে গিয়ে দেখে তার সারা গায়ে কী যেন ঝিকমিক করছে। নিচু হয়ে ভালো করে দেখে। একী, এ তো শিশির! হেমন্তের রাতভোর খোলা আকাশের তলায় থেকে ইঁড়িটা ভরে গেছে শিশিরে। খুব সাবধানে উঁচু করে ইঁড়িটা এক হাতের তেলোতে বসিয়ে আন্তে আন্তে বিল্টু চলে রাজপ্রাসাদের দিকে।

এতক্ষণে দেবরাজের কঠিন প্রাণ গলল। না, বিল্টুকে আর সাধারণ মানুষ ভাবা যাচ্ছে না। দেবতাদের মতোই অসাধ্যসাধন করতে পারে সে। খুশি মনে গুলু বলেন, বৎস তোমার ক্ষমতা দেখে আমি সন্তুষ্ট। তুমি রাজকুমারীর উপযুক্ত পাত্র। তবে তোমার বসবাস পৃথিবীতে। সেখানে তোমার একমাত্র সহায়সম্বল গোরুটি। যাও রাজপুরীর গোশালা থেকে তোমার গোরুটিকে নিয়ে এসো।

স্বর্গের প্রহরীরা বিল্টুকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় গোশালায়। বিল্টু সেখানে গিয়ে দেখে পাল পাল গোরু-বাচ্চুর। নধর হচ্ছে পুষ্ট। কিন্তু এত গোরুর মধ্যে তার সেই গোরুটাকে চিনবে কী করে? বিল্টু যতই একটার পর একটা গোরু দেখে, হাস্বাহাস্বা শোনে ততই দমে যায়। এ তো আচ্ছা মুশকিল। এত কাণ্ড করে, একশোজনের খাবার খেয়ে, তামার কুড়ুলে পাহাড়

ভেঞ্চে, ইঁড়িভরতি শিশির এনেও শেষ পর্যন্ত কিনা তীরে এসে তরী ডুববে। সাতপাঁচ ভাবে আর দেখে। গোশালার গায়ে বিরাট মাঠ। সবুজ ঘাসে চরছে দলে দলে গোরু-বাচ্চুর। হঠাৎ একটা মন্ত্র মৌমাছি তার কানের কাছে এসে ভেঁ ভেঁ করতে থাকে। বিরস্ত বিল্টু এক ঝাপটায় সরিয়ে দিতে যাবে এমন সময় মনে হল মৌমাছিটা গুনগুন করে কী বলছে। কান খাড়া করে শোনে,

রাজকুমারী মালিক আমার
তাঁরই হুকুম মানি,
যার শিঙেতে বসব আমি
নিজের জেনো তুমি।

ইতিমধ্যে প্রহরীরা সার বেঁধে গোরু নিয়ে এসেছে বিল্টুর সামনে। বিল্টুর চোখ কিন্তু গোরুর দিকে নয়, মৌমাছির দিকে। দেখে মৌমাছি উড়ে গিয়ে বসল একটা গাছের ডালে। অমনি বিল্টু মাথা নেড়ে বলল, উঁহু, এদের মধ্যে আমার গোরু নেই।

আরও এক পাল গোরু আনা হয়। এবারও মৌমাছি গাছের ডালে। বিল্টু মাথা নাড়ে, উঁহু, এদের মধ্যেও আমার গোরু নেই।

আবার এক পাল গোরু এল। এবারে বিল্টু দেখল, মৌমাছিটা বোঁ বোঁ করে উড়ে আসছে। এসে বসবি তো বস দিব্য নাদুনন্দুস একটা গোরুর শিঙে। অমনি বিল্টু চেঁচিয়ে ওঠে, এই যে, এটাই আমার গোরু।

তাজব ব্যাপার, মৌমাছি থামে না। আবার বোঁ করে উড়ে বসে গিয়ে একটা নধর বাচ্চুরের মাথায়। প্রথমে একটু দ্বিধায় পড়লেও কী একটা ভেবে সে তৎক্ষণাত বলে উঠল, এই বাচ্চুটিও আমার। স্বর্গে আসার পর আমার গোরু এর জন্ম দিয়েছে।

এবারে শুধু গুলু নয় স্বর্গের সব দেবতারাও মুগ্ধ। মানতেই হবে এই মানুষটা সত্যি বাহাদুর।

মহা ধূমধাম করে স্বর্গের রাজকুমারী নাস্তির সঙ্গে পৃথিবীর মানুষ বিল্টুর বিয়ে হয়ে গেল। স্বর্গ ছাড়ার সময় নাস্তি খুলে রাখে তার দামি রেশমি পোশাক, সর্বাঙ্গের গহনা। মর্তে নিয়ে আসে সব চেয়ে দামি যৌতুক—স্বর্গের রকমারি বিদ্যা। চাষবাস, রান্নাবান্না, হাতের কাজ, গানবাজনা, লেখাপড়া।

তারপর তারা সুখে ঘরকলা করতে আরম্ভ করল। তাদের সংসার এত শান্তির এত সুখের হয়ে উঠেছিল যে, কখনো কখনো লোকে বলত, বিল্টু শুধু স্বর্গের রাজকুমারীকেই জয় করে আনেনি, স্বর্গটাকেও পৃথিবীতে নামিয়ে এনেছে।

প্রস্তরবক্ষের অনৌরিক ফার্মকলাপ

সে অনেকদিন আগের কথা। আগ্নেয়গিরি দেবীর একটি ছেলে হল। দিব্য হষ্টপুষ্ট গাটাগোটা। মা ভাবলেন বড়ো হয়ে নিশ্চয় এক ডাকাবুকো বীর হবে। আদর করে নাম রাখলেন প্রস্তরবক্ষ। জন্ম থেকেই প্রস্তরবক্ষ সত্যিই সকলের সেরা হয়ে উঠল। বয়স যখন তার মোটে বছর খানেক, সবে এক-পা দু-পা টলে টলে হাঁটে, তখনই সে খেলতে খেলতে বানিয়ে ফেলে একটা তির-ধনুক। দৌড়েতে শিখে দিব্য শিকার করে পাখি, ছোটোখাটো জন্মজন্মের মধ্যে। শিশু প্রস্তরবক্ষের কাঞ্চকারখানায় সকলে যেমন অবাক তেমন খুশি। দেখতে দেখতে তার নাম জুড়িয়ে পড়ে চারদিকে।

একদিন সে সমুদ্রের ধারে ঝাউবনে নিজের মনে খেলা করছে। হঠাৎ দেখে একটু দূরে আকাশ থেকে একটা মন্ত্র ইগল পাখি উড়তে উড়তে সমুদ্রের জলের দিকে নেমে আসছে। হঠাৎ সেই পাখি ছোঁ মেরে জলের মধ্যে থেকে একটা ঢাউস বোয়াল মাছ তুলেই তীরের দিকে উড়ে এসে তাকে দড়াম করে আছড়ে ফেলে বালিতে। তারপর চলে যায় উড়ে। প্রস্তরবক্ষ দৌড়ে মাছটার কাছে হাজির। দু-হাতে লেজটা ধরে তুলে দেখে মাছটা মরে গেছে। কিন্তু একী! মাছটার সাদা ধৰ্ববে পেটবুক জুড়ে সরু তামার রেখা। প্রস্তরবক্ষের খুব কৌতুহল হল। পৃথিবীর সব তামা, মাটির তলার সমস্ত রকমের ধাতু তো তার মা আগ্নেয়গিরি দেবীর সম্পত্তি। জলের বাসিন্দা মাছের গায়ে মায়ের চিহ্ন কী করে এল? প্রস্তরবক্ষ লেজটায় তিরের ফলা ঢুকিয়ে একটানে পুরো চামড়াটা খুলে ফেলে। তামার চিহ্ন দেওয়া চামড়াটুকু রেখে বাকি মাছটা বিলিয়ে দেয় গাঁয়ের লোকদের। তারা প্রস্তরবক্ষকে ধনিয় ধনিয় করে পেট পুরে ভোজ খায়।

কদিনেই চামড়াটা শুকিয়ে বেশ বাকঝাকে সুন্দর দেখতে হল। আর মাপেও মন্ত্র। প্রস্তরবক্ষ ভাবল দিব্য বড়োসড়ো একটা জামা হয়ে যাবে। চামড়াটা গায়ে জড়িয়ে যেই না প্রস্তরবক্ষ মাপ নিতে গেছে অমনি সে থপাস করে মুখ খুবড়ে পড়ে গেল বালিতে। উঠতে গিয়ে দেখে একী, কোথায় গেল পা দুটো! মাটিতে ধড়ফড় করছে দিব্য পুরুষ্ট একটা বোয়াল মাছের লেজ। সে দু-হাতে ভর দিয়ে ওঠার চেষ্টা করল। কিন্তু তার হাত দুটোই বা গেল কোথায়? এ তো খুদে খুদে পাখনার মতো কী দুটো নড়ছে! উফ, হাঁপ ধরে যাচ্ছে যেন! জলে নামার জন্য যেন প্রাণটা আইটাই করছে। ভাগ্যিস প্রস্তরবক্ষ ছিল একেবারে জলের কিনারায়। যেই একটা বিরাট চেউ এসে ভেঙে পড়ল তারে অমনি তার ফেরতা স্বোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়ল প্রস্তরবক্ষ। কী আরাম। প্রাণ জুড়িয়ে গেল।

তার এখন আর কোনো সন্দেহই নেই। সত্যি সে হয়ে গেছে একটা বোয়াল মাছ! দিব্য তরতর করে সাঁতার কাটে। অভাব নেই খাওয়াদাওয়ার। চারিদিকে তার খাওয়ার জন্য কত মাছ!



মুখ খুললেই তারা প্রায় আপনি এসে পড়ে মুখের মধ্যে। ডাঙ্গায় খাবার জোগাড় করতে তার মাকে কত কী করতে হয়। হঠাৎ তার মনে খটকা লাগে। সে কি এখন থেকে সমুদ্রেই সব সময় থাকবে? মাঝের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হবে কী করে? মা যে তাকে না দেখে থাকতে পারে না। তা ছাড়া পৃথিবীর মাটির সঙ্গে তার নাড়ির বাঁধন। কত লোক তাকে ভালোবাসে। বিপদআপনে তারা প্রস্তরবক্ষের মুখ চেয়ে থাকে। নাঃ ডাঙ্গায় তাকে ফিরে যেতেই হবে।

সমুদ্রের বেলাভূমির কাছ বরাবর সাঁতরে এসে প্রস্তরবক্ষ এক লাফে তীরে উঠে পড়ে। খটকা দিয়ে খুলে ফেলে বোয়াল মাছের চামড়টা। ব্যস, কোথায় গেল তার লেজ, আর কোথায় পাখনা। দু-পায়ে আগের মতো দিবিয় দাঁড়িয়ে আবার প্রস্তরবক্ষ। চামড়টাকে ধুয়ে লুকিয়ে রাখে। এবার থেকে সে খুশিমতো জলে ডাঙ্গায় বাস করতে থাকে। কখনো চামড়া গায়ে সমুদ্রে বোয়াল মাছ, কখনো পৃথিবীতে আগ্নেয়গিরি দেবীর আদরের ছেলে। চামড়ার কথা কিন্তু কাউকে বলে না। এমনি করে দিন কাটে।

একদিন দক্ষিণ গাঁয়ের লোকেরা প্রস্তরবক্ষের কাছে দৃত পাঠাল। তাদের ভারী বিপদ। প্রস্তরবক্ষ যেন অতি অবশ্য আসে। কারো দুঃখকষ্ট প্রস্তরবক্ষ সইতে পারে না। জন্ম থেকে মা তাকে শিখিয়েছেন, আমরাই পৃথিবীর রক্ষাকর্তা। মাটির বাসিন্দাদের দেখাশুনা করা আমাদের কর্তব্য।

এদিকে দক্ষিণ গাঁ বহুদূরের পথ। পাহাড়-পর্বত মাঠঘাট পেরিয়ে পৌছোতে বহু সময় লেগে যাবে। বরং সমুদ্র দিয়ে গেলে সুবিধা। সুতরাং প্রস্তরবক্ষ বোয়াল মাছ হয়ে নেমে পড়ল সমুদ্রে। দক্ষিণ গাঁয়ের কাছে আসতে না আসতেই তার কানে এল বহু মানুষের চিৎকার। দেখে কি, এক পাল তিমি জেলেভরতি একটা ডিঙ্গিলোকো উলটে দিচ্ছে। অসহায় জেলেদের কী বুকফাটা আর্তনাদ! যেই কোনো জেলে সাঁতার কেটে মাথা তুলতে চেষ্টা করে অমনি ভীষণ এক তিমি হাঁ করে তাকে গিলে ফেলে। দেখতে দেখতে সব মানুষ অদৃশ্য। জলে ভাসতে থাকে নৌকোর পাটাতন, দাঁড়, বৈঠা।

এই ঘটনায় কিছুই করতে না পারার দৃঢ়ে প্রস্তরবক্ষের মনটা ভারী দমে যায়। এতগুলো মানুষ এরকমভাবে মারা পড়ল তার চোখের সামনে আর সে কিনা কিছুই করতে পারল না। ছিঃ, মা শুনলে কী ভাববেন। এক লাফে সে ডাঙায় উঠে বোয়ালরূপ ছেড়ে ফেলে। আস্তে আস্তে এগোয় গাঁয়ের দিকে।

সেখানে শোচনীয় দৃশ্য। প্রত্যেক বাড়ি থেকে ভেসে আসছে বুকফাটানো বিলাপধ্বনি আর কান্নার শব্দ। বাড়ি বাড়ি ঢুকে দেখে সকলের ভাঁড়ার শূন্য। খুন্দকুড়োটিও নেই। জেলে গাঁ। মাছ ধরেই এদের সংসার চলে। ক-মাস ধরে শুরু হয়েছে তিমিদের এই উৎপাত। যারাই মাছ ধরতে সাগরে যায় আর ফেরে না। এদিকে বাড়িতে বসে থাকলে থাবে কী? প্রস্তরবক্ষের প্রচঙ্গ রাগ হল। নাঃ, এ অত্যাচারের বিহিত করতেই হবে। স্বয়ং তিমিরাজ কাগাইকেই শিক্ষা দিতে হবে। এমন শিক্ষা দেবে যা দেখে অন্য কোনো তিমি আর কখনো মানুষজনের ওপর এমন হামলা চালাতে সাহস করবে না।

যে কজন পুরুষ মানুষ ধূঁকতে ধূঁকতে বেঁচেছিল তাদের জুটিয়ে নিয়ে বেশ শক্তপোষ্ট একটা নৌকো বানায় প্রস্তরবক্ষ। সেটাকে এনে রাখে জলের ধারে। দু-হাত মুখের কাছে চোঙের মতো করে জোরে হাঁক ছাড়ে, কা-গা-ই, কা-গা-ই, কা-গা-ই।

একবার নয় দু-বার নয় তিনবার নয় পর পর দশবার ডাকে। তিমিরাজ কাগাইয়ের কোনো সাড়াশব্দ নেই। এক লাফে ডিঙ্গিতে চড়ে বসে জোরে জোরে দাঁড় বাইতে থাকে প্রস্তরবক্ষ। ডিঙ্গি সমুদ্রের ভিতর তরতর করে যাচ্ছে।

হঠাতে সমুদ্রের জল উঠালপাথাল। ভেসে উঠছে যেন বিশাল পাহাড়-টাহাড় কিছু। দেখ না দেখ তার মুখ খুলে গেল। বিরাট হাঁ, দু-পাশে এই বড়ো বড়ো দাঁতের সারি। তিমিরাজ কাগাই। প্রস্তরবক্ষকে খেতে এসেছে। সবচেয়ে শক্তিশালী তির বাগিয়ে তৈরি প্রস্তরবক্ষ। সাঁ করে ছুঁড়ল কাগাইয়ের কুতকুতে চোখ দুটোর মাঝখানের কপাল লক্ষ্য করে। কাগাইও কম চালাক নয়। ঝাপ করে ডুব দেয় জলে। তির তার বিরাট মুণ্ডু ছুঁয়ে বেরিয়ে যায়। দেখ না দেখ আবার জেগে ওঠে তার বিশাল হাঁ। তাড়া করে প্রস্তরবক্ষকে। এই বুঝি নৌকোসুন্দু গিলে ফেলে তাকে। মনে মনে মাকে প্রণাম করে প্রস্তরবক্ষ ঝাঁপ দিল কাগাইয়ের হাঁ করা মুখের মধ্যে। কপ করে মুখ বন্ধ করে কাগাই ডুব দেয় সমুদ্রের গভীরে। দূরে ডাঙায় দাঁড়ানো মেঘেপুরুষ ছেলেপুলে হায় হায় করে



ওঠে। তাদের বীর প্রস্তরবক্ষকে গিলে ফেলল তিমি। এখন কী হবে? আর তাদের কোনো ভরসাই রইল না।

এদিকে তিমিরাজের পেটের মধ্যে প্রস্তরবক্ষ কি হজম হয়ে গেল? মোটেই নয়। আগ্নেয়গিরি দেবীর ছেলে সে। কোমরে বাঁধা সেই জাদু বোয়াল-চামড়া। দুটো বাছা বাছা তির চামড়াটার তামা রেখায় ছুঁয়ে প্রস্তরবক্ষ ছুঁড়ল কাগাইয়ের পেটের দু-দিকে। তিরের ফলা থেকে বেরিয়ে এল জুলন্ত লাভার মতো আগুন। কাগাইয়ের ইয়া মোটা পেটটা ঝলসে এফোড়-ওফোড় হয়ে গেল। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে তিমিরাজ কাগাই-এর মৃত্যু হল। তার অবস্থা দেখে অন্য তিমিরা তো ভয়ে অস্থির। চল চল পালা পালা। দলবলসুন্ধ তারা পাড়ি দেয় বহুদূরে। মানুষের ধরাছোয়ার বাইরে।

এদিকে মরা কাগাইয়ের শরীরটা ঢেউয়ে ভেসে ঠেকল ডাঙ্গায়। প্রস্তরবক্ষ একটা তির মেরে কাগাইয়ের বন্ধ মুখ খুলে বেড়িয়ে এল। গাঁয়ের লোক তো একেবারে থ। যে যেখানে পালিয়ে ছিল সবাই ফিরে এল। আর বিপদ নেই। আবার তারা মাছ ধরতে বেরোবে, মা-বোন ছেলেমেয়েদের মুখে ফোটে হাসি। প্রস্তরবক্ষকে ঘিরে তারা আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠে।

২

কাগাইয়ের চামড়াটা ছাড়িয়ে রোদে শুকিয়ে নেয় প্রস্তরবক্ষ। পেটের দু-পাশ পুড়ে গর্ত হয়ে যাবার দরুন বোয়ালমাছের চামড়াটার মতো অত নিখুঁত হল না। তবু প্রস্তরবক্ষের কাজে লাগে। কাগাইয়ের

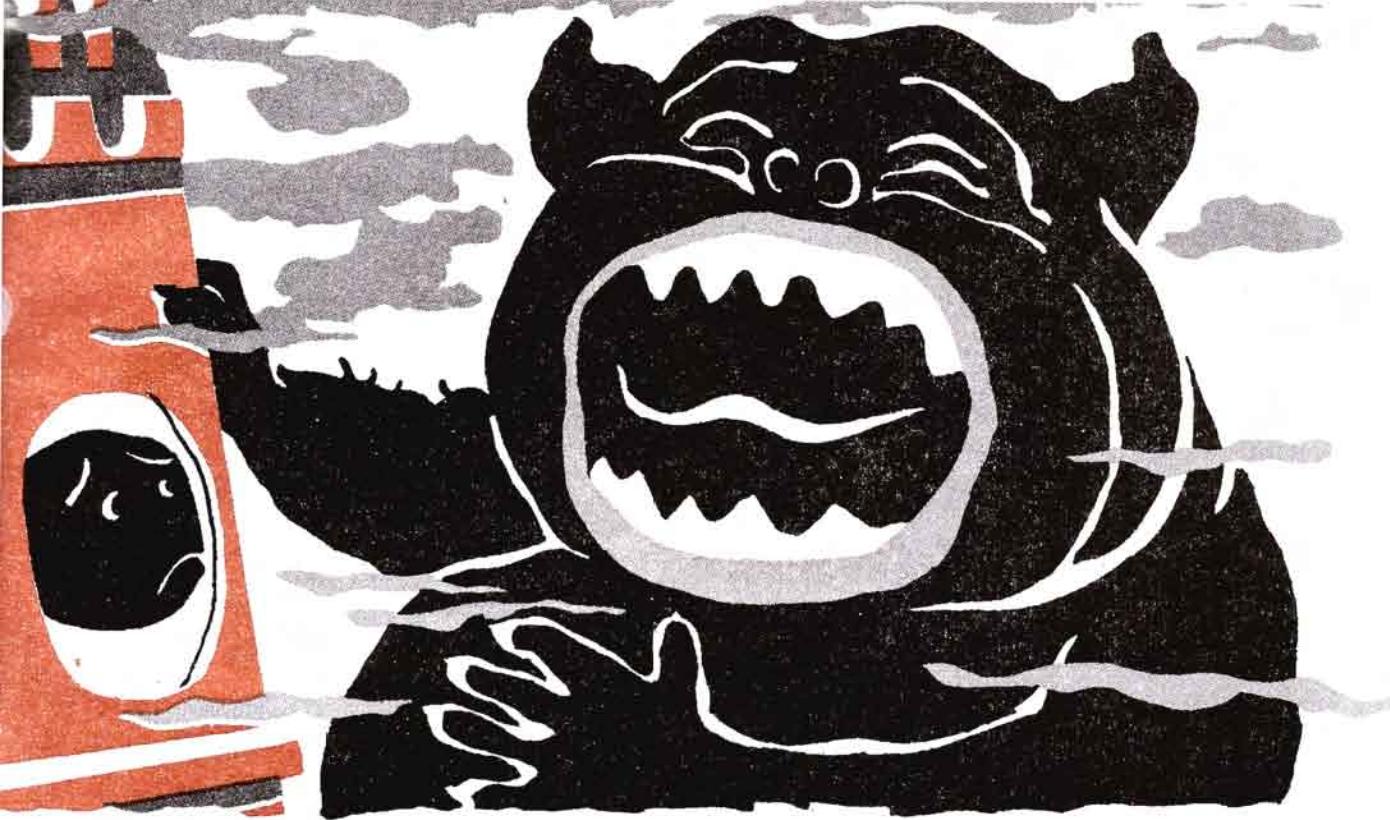
চামড়ার মধ্যে ঢুকে সে হয়ে যায় সাক্ষাৎ তিমিরাজ। প্রচণ্ড বেগে যোজনের পর যোজন অনায়াসে সাঁতরে চলে। সাগর পাড়ের সব গাঁয়ের সে এখন বিনে মাইনের পাহারাদার। মানুষের ধারে কাছে ঘেঁষতে পারে না কোনো খারাপ জলজন্ম, হাঙর কিংবা দলছুট রাক্ষসে তিমি। ছেলেরা নিশ্চিন্তে নৌকোতে মাছ বোঝাই করে ঘরে ফেরে। তাদের খাওয়াপরার কোনো অভাব নেই। গাঁয়ে গাঁয়ে লক্ষ্মীশ্রী।

প্রস্তরবক্ষের দিন কাটে মহানন্দে। এখন সে জলেই বেশ মজা পায়। কখনো তিমিরাজ, কখনো বোয়াল মাছ। যখন যা খেয়াল চাপে। সমস্ত সমুদ্র দাপিয়ে বেড়ায়। যেন তারই রাজ্য। একদিন সে তিমির বেশে সাঁতরে মশগুল হয়ে সমুদ্রের মধ্যে বহুদূর চলে গেছে। হঠাৎ দেখে তার চারিদিকে যেন দেওয়াল। কোথায় গেল বিপুল জলরাশি। একটা ঘরের মধ্যে সে বন্দি। ওপরে এক কোণে একটি জানালা। সেখান দিয়ে উঁকি মেরে দেখে বাইরে বিশাল সমুদ্র ঠিক একই রয়েছে। বিশ্বে হতভম্ব প্রস্তরবক্ষ। সমুদ্রের মধ্যে এমন ঘর হল কী করে? শরীরটা তার তিমি মাছের মতো বটে কিন্তু মগজটা তার নিজের। সে তৎক্ষণাত্ম বুঝে ফেলে ঘরটায় আছে কোনো জাদু। এখন সে কী করবে?

তার ভাবনাচিন্তা শেষ হওয়ার আগেই শোনা গেল বাজখাই গলায় অটহাসি, হা হা হা। হা হা। কী হে কাগাই, কেমন আছ বন্ধু? মনে পড়ে সিন্ধুদানবকে? সেবারে খুব চালাকি করেছিলে আমার সঙ্গে। আমার মুখের শিকার কেড়ে নিয়েছিলে। এবারে তার শোধবোধ। আজকের রাতটা উপোসে থাকো। আমিও উপোসে থাকি। কালকে তুমি যাবে যমের বাড়ি, আমার হবে ভুরিভোজ। হা হা হা হা হা।

প্রস্তরবক্ষ শুনতে শুনতে তো ভারী ঘাবড়ে গেল। দৈত্যটা ধরে নিয়েছে সে সত্যি সত্যি তিমিরাজ কাগাই। এখন আসল পরিচয় দিলেও বিশ্বাস করবে কি না সন্দেহ। কী কুক্ষনেই না আজ তিমির চামড়াটা পরেছিল। শুধু প্রস্তরবক্ষ হয়ে থাকলে তাকে দানব ছুঁতও না। এমন কি বোয়াল মাছ হয়ে থাকলেও তার বিষ নজরে পড়ত না। ভাবতে না ভাবতে বুদ্ধি বিলিক দিয়ে উঠল। এমন গভীর জলে প্রস্তরবক্ষ হয়ে বাঁচা যাবে না বটে। কিন্তু বোয়াল মাছ হলে তো দিব্য চলবে। তাড়াতাড়ি প্রস্তরবক্ষ তিমির বেশ ছেড়ে পেটের মধ্যে গেঁজা বোয়ালের চামড়াটা বের করে পরে ফেলে। সিন্ধুদানব তার ভাঁটার মতো দুটো চোখে ড্যাবড্যাব করে দেখে তার জাদুকামরার জানালা দিয়ে সুড়ুৎ করে বেরিয়ে গেল একটা বোয়াল মাছ। একটু খটকা লাগে তার। মাছটা তার জাদুর মধ্যে ঢুকেছিল কী করে? তারপর ভাবে যাকগে, বোয়াল মাছ বই তো নয়।

এদিকে প্রস্তরবক্ষ প্রাণপণে সাঁতরে চলেছে দেশের দিকে। চারিদিকে শুধু জল আর জল। কোথাও ডাঙার চিহ্ন নেই। বহুক্ষণ সাঁতরে প্রস্তরবক্ষ পৌঁছোয় একটা অজানা দেশে। যাহোক, ডাঙা তো। প্রস্তরবক্ষ উঠে পড়ে। একটু জিরিয়ে না নিলেই নয়। এত ক্লান্ত তার কোনোদিন লাগে না। মাছের চামড়াটা খুলে শুকোতে দেয়। পাশে রাখে তিমির ছালটা। চোখের পাতা যেন লেগে



আসছে। শুতে না শুতেই ঘুমিয়ে পড়ে সে। আধো ঘুমের মধ্যে দেখে ছায়ার মতো বিরাট একটা চিল আকাশ থেকে উড়তে উড়তে নীচে নেমে আসছে। আরে আরে! পাখিটা যে মাটি থেকে ছোঁ
মেরে তুলে নিল তার এত সাধের চামড়াদুটো। প্রস্তরবক্ষের চটকা ভেঙে যায়। তাড়াতাড়ি উঠে
ধনুকে তির লাগিয়ে মারতে যাবে, দেখে আশ্চর্য, কই পাখি! এর মধ্যেই উধাও।

অবাক প্রস্তরবক্ষ দেখে ওপরে সুন্দর নীল আকাশ, সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে। হঠাৎ
ভেসে আসে এক আকাশবার্তা, বাছা প্রস্তরবক্ষ, চামড়াদুটো তোমার আর দরকার নেই। মানুষের
দৃঃখ্যদৃংশায় সাহায্য করার জন্য ও-দুটো তুমি পেয়েছিলে। তোমার কর্তব্য তুমি করেছ। এখন
নিজের শখের জন্য চামড়াদুটো রাখলে বিপদে পড়বে। মনে রেখো, চমৎকারি শক্তি অন্যের
মঙ্গলের জন্য, নিজের খেয়ালখুশি মেটাবার জন্য নয়। তুমি এখন খুশি মনে ফিরে যাও তোমার
মায়ের কাছে।

প্রস্তরবক্ষ চারিদিকে তাকায় কিন্তু কাউকে দেখতে পায় না। মনটা তার একটু খারাপই হয়ে
গেল। চামড়াদুটো নিয়ে সে বড়ো দাপটে ছিল। যাই হোক কী আর করা। এখন বাড়ি ফিরতে
হবে! তীর দিয়ে দিয়ে চলতে থাকে। অনেকদিন পরে সে এসে পৌঁছোয় তার মায়ের কাছে।
মাকে গিয়ে বলে তার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা। আশ্রমের দেবী তার অলৌকিক কীর্তিকাহিনি
শুনে খুব তুষ্ট। আদর করে তিনি তার নাম দিলেন স্ফটিকবক্ষ। নতুন নামে নতুন বৃপ্তে স্ফটিকবক্ষ
পৃথিবীর আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতো জীবনযাপন করতে লাগল।

জয় হোক মানুষের

সে অনেকদিন আগের কথা। পৃথিবী সৃষ্টি শেষ। গাছগাছালি, ফুলেফলে মাটি গেছে ছেয়ে। নীল সমুদ্র দু-হাতে জড়িয়ে ধরে আছে সবুজ পৃথিবীকে। তার ঢেউয়ের সাদা ফেনা সোনালি বালিকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে ফিরে আসে অবিরাম। বহুদূর স্বর্গ থেকে দেখেন চার দেবতা—হরিদ্বার্বণ, রক্তবর্ণ কৃষ্ণবর্ণ এবং নির্বর্ণ। দেখেন আর নিজেরাই মুগ্ধ হন। কী সুন্দর এই পৃথিবী। তাঁদেরই হাতে গড়া। কিন্তু তাঁরা কজন ছাড়া আর কেই বা জানবে এই অপরূপ সৃষ্টির কথা? আর কেই বা আছে যে অন্যদের জানাতে পারে?

চার দেবতা বসলেন এক বৈঠকে। প্রথমে কথাটা পাঢ়লেন হরিদ্বার্বণ।

—পৃথিবী নির্মাণ তো শেষ হল। এবারে এসো আমরা তৈরি করি এমন জীব যে আমাদের কীর্তির গৌরবের কথা বলবে। মনে রাখবে গাছপালায় ঝোপেঝাড়ে অজস্র ফুলফল আমরা পৃথিবীতে ভরে দিয়েছি। তাই দিয়েই তো আমাদের পুজো হতে পারে। কিন্তু পুজোর মন্ত্র রচনা করবে শুধু সে, নিজের ইচ্ছায়, আমরা নই, আমাদের কথায় নয়। অপর তিনজন দেবতা ভাবলেন, সত্যিই তো কথাটা ন্যায়। এত যত্নে, এত শ্রমে তাঁরা বিশ্বব্রহ্মাঙ্গ গড়েছেন সেকথা যদি কেউ না জানল তাহলে তাঁদের কর্ম্যজ্ঞ তো বৃথা। রক্তবর্ণ এবারে বললেন, সে তো বটেই। কিন্তু এমন জীব কে হবে, যে নিজে জেনে মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারবে? হরিদ্বার্বণ উত্তর দিলেন, সে হবে মানুষ। আমাদের শেষ সৃষ্টি।

কৃষ্ণবর্ণ প্রশ্ন করলেন, কী দিয়ে তৈরি হবে মানুষ?

হরিদ্বার্বণ উত্তরে এক খাবলা মাটি তুলে নিলেন। দু-হাতে টিপে টিপে গড়লেন একটি শরীর হাত পা। আঙুলের ডগা দিয়ে ফুটিয়ে তুললেন নাক-মুখ-চোখ। অন্য সবাই চুপচাপ দেখছেন। গড়া শেষ হল। মূর্তিটি সকলেরই খুব পছন্দ। বেশ দেখতে হয়েছে। তাঁদেরই মতো। যেন মাটির দেবতা।



কৃষ্ণবর্ণ বললেন, এবারে মাটির মানুষের পরীক্ষা হোক।

আলতো করে তাকে জলের মধ্যে ছেড়ে দিলেন হরিদ্রাবর্ণ। একী! কোথায় তার অমন কাটাকাটা নাক-মুখ-চোখ, কোথায় হাত-পা! দেখতে না দেখতে জলে গলে গেল। যেন নুনের পুতুল। গন্তীর মুখে মাথা নাড়লেন চার দেবতা। না, এ তো চলবে না।

এগিয়ে এলেন রস্তবর্ণ। বলেন, মানুষ তৈরি করা যাক কাঠ দিয়ে। গাছ থেকে বেশ শস্ত্রপোক্ত একটি ডাল কেটে নিলেন। ছুরির ধারালো ফলায় কেটেকুটি তৈরি হল মানুষের শরীর হাত পা। সাবধানে কুঁদলেন নাক-মুখ-চোখ। বাঃ দিব্য দেখতে, যেন খেলনাটি।



কৃষ্ণবর্ণ বললেন, এবারে কাঠের মানুষের পরীক্ষা হোক। রস্তবর্ণ কাঠের মানুষকে জলে ফেলে দিলেন। না, গলল না সে। দিব্য একরকম রইল। দেবতারা ভারী সন্তুষ্ট। হরিদ্রাবর্ণ বললেন, তাহলে এবারে দ্বিতীয় পরীক্ষাটা হোক। জ্বালানো হল আগুন। তাতে ফেলে দেওয়া হল কাঠের মানুষকে। অমনি চিঢ়চিঢ় চড়চড় করে একে একে হাত-পা নাক-মুখ জ্বলে উঠল। দাউদাউ জ্বলতে থাকে তার সমস্ত শরীর। আগুন নেভার পর দেখা গেল পড়ে আছে একরাশ ছাই। দেবতাদের মাথায় হাত। কীসে তাহলে তৈরি হবে এমন মানুষ যে টিকবে, বাঁচবে?

অনেকক্ষণ ধরে চলল দেবতাদের তক্কবিতর্ক। অবশেষে অনেক মাথা খাটিয়ে কৃষ্ণবর্ণ বললেন, এক কাজ করা যাক। সবচেয়ে যা টেক্সই, তাই দিয়ে এসো মানুষ গড়ি। আমার বুমালে এই যে বাঁধা একতাল সোনা। সোনার চেয়ে বেশি আর কী টেকে? বুমাল খুলে কৃষ্ণবর্ণ সোনা বের করেন। অন্যরা চুপ করে দেখতে থাকেন। কৃষ্ণবর্ণ কেমন একমনে গড়ছেন অপূর্ব চেহারার এক মূর্তি। সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে তার অপরূপ লাবণ্য। দেবতাদের চেয়ে এ তো দের সুন্দর।

যথারীতি তার পরীক্ষা শুরু হয়। ফেলা হল জলে। না, সে মোটেই গলল না। ছুঁড়ে দেওয়া হল গনগনে আগুনের কুঞ্জে। না, তার গায়ে আগুন ধরে না। দেবতারা তো আঙ্গাদে আটখানা। এইবার সৃষ্টি হয়েছে তাঁদের মনের মতো মানুষ। সোনার মানুষকে তাঁরা দাঁড় করিয়ে দেন। দূরে নিজেরা গিয়ে বসেন। কত আশা। এইবার শোনা যাবে তাঁদের স্তুতি, তাঁদের এত চেষ্টা এত পরিশ্রমের প্রতিদান। একটু ভক্তি, একটু প্রশংসা। পাবেন পূজা অর্চনা।



কিন্তু কই, সোনার মানুষের মুখ থেকে একটি শব্দও বেরোয় না। তেমনি নিশ্চুপ, নিশ্চল দাঁড়িয়ে। এত সাধ করে গড়া হয়েছে যাকে তার মনে এতটুকু কৃতজ্ঞতা নেই, নেই শ্রদ্ধা। ক্ষোভে দুঃখে কৃষ্ণবর্ণ ‘দূরছাই’ বলে ছুঁড়ে ফেলে দেন সোনার মানুষকে। সেই দূরে পৃথিবীর কোন আঘাটায় যে সে গিয়ে পড়ল কেউ তার হাদিশ রাখল না।

এতসব কাণ্ডের মধ্যে বিশেষ মুখ খোলেননি একজন। তিনি নির্বর্ণ। এখন সবাই তাঁর দিকে ঢাইলেন। শেষ ভরসা তো তিনি। সকলের প্রশ্ন, কী দিয়ে তৈরি হবে মানুষ?

এক মুহূর্ত স্তুর্ধ থেকে নির্বর্ণ বলে ওঠেন, পৃথিবীর মানুষ হবে রক্তমাংসের।

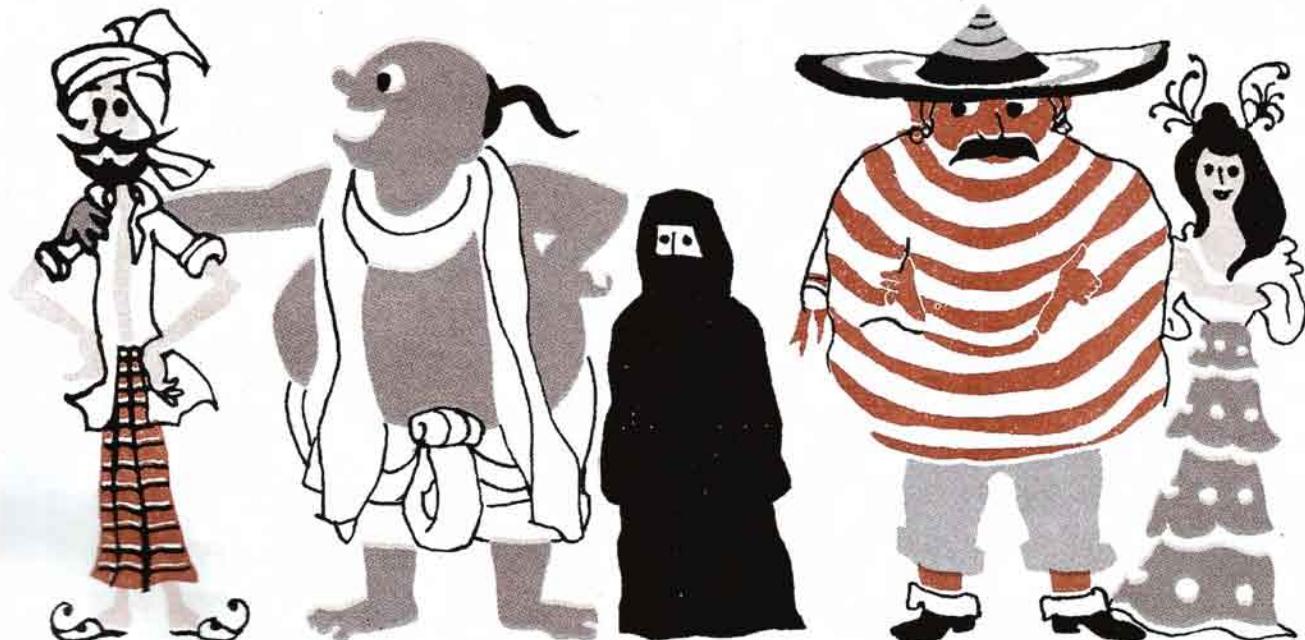
রক্তমাংসের! হতভন্ন হরিদ্রাবর্ণ রক্তবর্ণ কৃষ্ণবর্ণ। কোথায় পাওয়া যাবে রক্তমাংস? কোনোক্রমে জিজ্ঞাসা করে কৃষ্ণবর্ণ। কিছু না বলে একটা ছুরি বের করে নির্বর্ণ ঝঁঘাচঝঁঘাচ করে



কেটে ফেলেন তাঁর নিজের হাতের আঙুল। চোখের পলকে রস্তমাখা আঙুলের টুকরোর মাংসগুলো তিড়িং তিড়িং করে দাঁড়িয়ে গেল। এক-একটি মানুষ। কেউ ফর্সা, কেউ কালো, কেউ বাদামি, কেউ হলুদ। একজন ঢাঙা তালগাছ তো আর একজন বেঁটে বক্সের। কারো চোখ নীল, কারো খয়েরি, কারো নাক খাঁড়া, কারো বোঁচা। একজনের চুল কালো তো অন্যের সোনালি, খয়েরি কত কী। সত্যি কথা বলতে কি, খুব খুঁটিয়ে প্রত্যেককে দেখার সুযোগই হল না।

রস্তমাংসের মানুষ স্বর্গে নিমেষ কয়েক দাঁড়িয়ে থেকেই দিল এক লাফ। সো—জা গিয়ে পড়ল বহু বহু দূরে পৃথিবীর মাটিতে। জলে আগুনে তাদের যাচাই করার অবকাশই পেলেন না দেবতারা। সৃষ্টি হতে না হতেই রস্তমাংসের মানুষ স্বাধীন। দেবতাদের নাগালের বাইরে। এবারে হাল ছেড়ে দেন তাঁরা। আর তাঁদের স্তবন্তি, মন্ত্রটন্ত্র শোনার আশা নেই। হরিদ্রাবর্ণের হাই উঠল। তাঁর দেখাদেখি বাকি তিনজনের। একেই তো তাঁদের অনেক বয়স হয়েছে তারওপর বিশ্বব্রহ্মাঙ্গ সৃষ্টি। পৃথিবী সাজানো গোছানো, শেষে বারবার মানুষ গড়ার ঝামেলা। সত্যি তাঁরা ভারী ক্লান্ত। ঘুমিয়ে পড়েন দেবতা চারজন। একেবারে অঘোরে ঘুম। কেটে যায় বছরের পর বছর। যুগের পর যুগ।

রস্তমাংসের মানুষ জ্ঞান হতে না হতেই দেখছে তারা দাঁড়িয়ে পৃথিবীর মাটিতে। স্বর্গ ছেড়েছে চোখ মেলতে না মেলতে। দেবতাদের এক ঝলক দর্শন পেয়েছে কি পায়নি। অর্থাৎ স্বর্গ, দেবতা এসব কিছু আদৌ আছে কি না তাই তারা জানে না। আর না জেনে তাদের কিছু আসে যায় না। দিব্য জীবন কাটে। পৃথিবীর মাটিতে ফলে তাদের খাবার, ফলমূল। নদী নালা দিঘি মেটায় তাদের তেষ্টা। বাস করে প্রকৃতির কোলে। শীতে বর্ষায় আশ্রয় নেয় গুহাগহ্নে। দেবতাদের





কথা তাদের মনে পড়বে কী করে? পৃথিবীর মাটিতে তারা, তাদের ছেলেপুলেরা বেঁচেবর্তে থাকে। মরার পর মাটিতেই মিশে যায় তাদের শরীর। বছরের পর বছর কাটে, যুগের পর যুগ।

ফলমূলের খোঁজে একদিন ঘুরতে মানুষের দল বনের গহনে হাজির। হঠাৎ দেখে ঝোপঝাড়ের মধ্যে পড়ে আছে এক অপূর্ব মানুষ, তার গায়ের সোনালি ঝকমকান্তিতে যেন চারিদিক আলো। এমন অপরূপ চেহারা তাদের কারো নয়। সত্যি, কথা বলতে কী, এমন রূপ তাদের কল্পনাতেও নেই। খানিকক্ষণ হতবাক হয়ে তারা দাঁড়িয়ে। তারপর একজন সাহস করে ছোঁয় সোনার দেহটি। কী ঠাণ্ডা। যেন পাথর। তরতাজা মানুষের দল হতভস্ত। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে, কে এই সোনার মানুষ?

—এমন একলাটি বনের মধ্যে শুয়ে কেন? বাঘ সিংহের ভয় নেই?

—কী তার ইচ্ছে?

—তার কি বলার কিছু নেই?

মূর্তি যেমন ছিল তেমনি পড়ে থাকে। নিশ্চল নিশ্চুপ সুন্দর। এদিকে বেলা পড়ে আসে। রক্তমাংসের মানুষ চণ্ডল হয়। তাই তো পেটের ব্যবস্থা করা হয়নি। একজন সেখানে পাহারায় থাকে, বলা তো যায় না হিংস্র জানোয়ার কী করে। অন্যরা কাছে পিঠে যা পায়, কষাটে ফল, শিকড়বাকড়, কন্দ তুলে আনে। একসঙ্গে বসে খেতে। মুখে গ্রাস তুলতে গিয়ে মনে পড়ে, আরে



সোনার মানুষটা খাবে না? ওর নিশ্চয় খিদে পেয়েছে। কিন্তু সে তো খাবার জোটানোর কোনো চেষ্টাই করেনি। আলাপ আলোচনা চলে, বেচারা হয়তো না খেয়ে এরকম হয়ে গেছে। ওঠার ক্ষমতা নেই।

—আমরা গবগব করে খাব আর ও চেয়ে দেখবে তাই কখনো হয়?

—হয়তো কথা বলতে পারে না তাই খিদের কথা বলে না। একজন পাতায় ধরে ঝরনার স্ফটিক জল ফোঁটা ফোঁটা ঢালে সোনার মানুষের ঢেঁটের ফাঁকে। আর একজন তার মুখে দেয় হাতেচেপা বুনো জামের রস। সকলের মনে হয় সোনার মানুষের পাথর ঠাণ্ডা বুকে যেন লাগে প্রাণের ছোঁয়া। এবার তারা নিশ্চিন্তে খাওয়াওয়া সারে। তারপর পেট-টেট ভরে গেলে বলাবলি করে, এমন সুন্দর মানুষটাকে এখানে একলা ফেলে যাব?

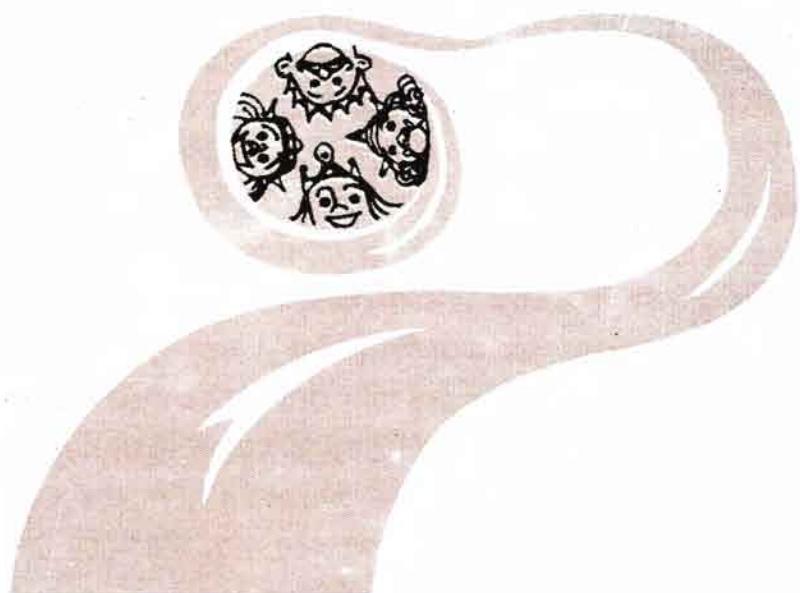
—না, না। চলো ওকে আমাদের দলে নিই। ধরাধরি করে তাকে সকলে নিয়ে চলে সঙ্গে। প্রতিদিন পালা করে তার নিজেদের খাবারের ভাগ দেয়। বনেজঙ্গলে গিরিকণ্ডরে যখন যেখানে থাকে, সঙ্গে তাদের সোনার মানুষ। কেউ না কেউ তার সঙ্গে কথা বলে। গায়ে হাত বোলায়। আশা একদিন না একদিন সে সাড়া দেবে। রাতে অন্য সবার সঙ্গে তার শয্যা তৈরি করে গাছের ভালে। রক্তমাংসের মানুষের আদরে যত্নে তিলতিল করে নরম হয়ে আসে সোনার মানুষের কঠিন হৃদয়। তার হিমশীতল প্রাণে লাগে রক্তমাংসের উষ্ণতা।

অবশ্যে, একদিন তার মুখ থেকে বেরোল শব্দ। না, রক্তমাংসের মতো খাবার শোবার কথা নয়। এক অপূর্ব গান। সেই বন্দনা যা শোনার জন্য ব্যাকুল দেবতারা। এত বছর ধরে যা সকলে ভুলেই গেছে। আজ এতকাল পরে সৃষ্টিকর্তার প্রতি সেই ভক্তি সেই শ্রদ্ধার নাম প্রথম শুনল পৃথিবীর মানুষ। তারা তো মুগ্ধ। তাদের জানা ছিল না মানুষ কথা দিয়ে, আওয়াজ দিয়ে এমন সৃষ্টি করতে পারে। যেন এক অন্য জগতের দ্বার খুলে যায়। তারা বলে, আহা! আমাদের সোনার মানুষের কী গুণ!

—কী অসাধারণ তার ক্ষমতা!

মেহ-ভালোবাসা-ভক্তিতে উচ্চলে পড়ে তাদের হৃদয়। এদিকে দেবতাদের কানে এসে পৌঁছোয় সংগীতের ধ্বনি। অবশ্যে ভাঙ্গে এত বছরের ঘূম। উঠে বসেন তাঁরা। কান পেতে শোনেন তাঁদের উপাসনা আরাধনা। তৃপ্ত হয় তাঁদের বাসনা। দু-হাত তুলে তুষ্ট হরিদ্বারণ, রক্তবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ সোনার মানুষকে আশীর্বাদ করতে যান। বাধা দেন নির্বর্ণ।

—ভুলে যেয়ো না সোনার মানুষের ভজনপূজন রক্তমাংসের মানুষেরই দান। তারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অন্যের ভরণপোষণ করে। তাদের যত্নে ভালোবাসায় জাগে সোনার মানুষের হৃদয়। ভালোবাসা ছাড়া কি সৃষ্টি হয়? তখন চার দেবতা একসাথে গলা মিলিয়ে উচ্চারণ করেন আশীর্বচন, জয় হোক মানুষের। বেঁচে থাক মানুষের ভালোবাসা।





বর্তমান শিশু ও কিশোর সাহিত্য এবং বিনোদনে তথাকথিত বিজ্ঞান-কারিগরিবিদ্যার এক অশুভ দৌরান্ত পরিলক্ষিত হয়েছে, যার মূল সূর প্রায়শ উত্তেজনা সংঘর্ষ এবং উর্ধ্বরক্ষাস গতি। অথচ এর বাইরে আছে আর এক পৃথিবী, যেখানে পাওয়া যায় অমল সরলতা, ধীর লয় ও শান্ত সমন্বয়। এ পৃথিবীতে মানুষ তার কঞ্চনা, বুদ্ধি ও হৃদয়ের ঐশ্বর্যে জয়ী। সেইরকম এক সুন্দর পৃথিবীর গল্প দিয়ে গাঁথা আফ্রিকা ও উত্তর আমেরিকার এই লোককাহিনিগুলি।

